হারুকি মুরাকামি
আফটার ডার্ক
BanglaBook.org
অনুবাদ : তানজীম রহমান
ওয়াসি আহমেদ

মাঝরাত নেমে আসছে প্রায়-শূন্য এক রেস্টুরেন্টে। কফিতে চুমুক দিচ্ছে মারি, চোখের সামনে খোলা বই, কিন্তু একাকিত্বের শান্তি বেশিক্ষণ উপভোগ করা হয় না ওর। অ্যালফাভিল হোটেলে একজন মেয়েকে নির্মমভাবে মারধোর করা হয়েছে, তাকে সাহায্য করতে হবে এখনই।
অন্য কোথাও মারি'র বোন এরি তলিয়ে গেছে গভীর ঘুমে। অস্বাভাবিক রকমের নিখুঁত সে ঘুম, অসম্ভব গাঢ়। দু'মাস ধরে এরিকে জড়িয়ে রেখেছে ঘুমের মায়াজাল। আজ রাত বারোটায় ওর বেডরুমের টিভি স্ক্রিনে ঝলসে উঠেছে সাদা আলো। টিভিটার প্লাগ কিন্তু দেয়ালের সাথে লাগানো নেই।
বিশ্বনন্দিত লেখক হারুকি মুরাকামি'র লেখা *আফটার ডার্ক* এক অদ্ভুত সুন্দর উপন্যাস, যেখানে বাস্তবের ছায়ায় বাস করে পরাবাস্তব। যেখানে অপরিচিত সব চেহারা হয়ে ওঠে পরিচিত, যেখানে রাত গায় রহস্য আর নিঃসঙ্গতার গান।

ISBN 984872941-0
9 789848 729410
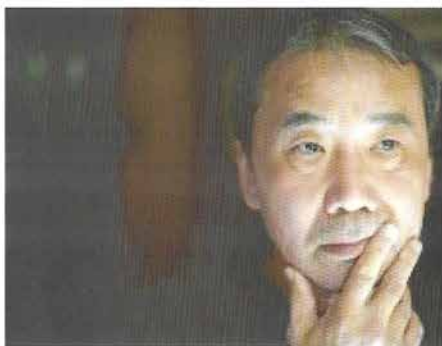
জাপানের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হারুকি মুরাকামি। ১৯৪৯ সালে কোবেতে তার জন্ম। শুধু নিজ দেশেই নন, বিশ্বজুড়ে পরিচিত এ লেখকের গল্প-উপন্যাস পঞ্চাশটিরও বেশি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ১৯৭৯ সালে তার প্রথম উপন্যাস শোনো বাতাসের সুর প্রকাশিত হয়। তার অন্য বইগুলার মধ্যে রয়েছে পিনবল ১৯৭৩ (১৯৮০), নরওয়েজিয়ান উড (১৯৮৭), ড্যান্স ড্যান্স ড্যান্স (১৯৮৮), সাউথ অব দ্য বর্ডার, ওয়েস্ট অব দ্য সান (১৯৯২), কাফকা অন দ্য শোর (২০০২) ও আফটার ডার্ক (২০০৪)।

অ্যাফটার ডার্ক

হারুকি মুরাকামি

অনুবাদঃ

তানজীম রহমান
ওয়াসি আহমেদ

বাতিঘর প্রকাশনী

আফটার ডার্ক

মূল : হারুকি মুরাকামি

অনুবাদ : তানজীম রহমান ও ওয়াসি আহমেদ

After Dark

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি২০১৮

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয়তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর; গ্রাফিক্স: ডটপ্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

তানজীম রহমানের **উৎসর্গ :**

যারা অদ্ভুত

যারা নিঃসঙ্গ

যারা বেমানান

যারা নীরব

তাদের জন্য...

ওয়াসি আহমেদ রাফি'র **উৎসর্গ:**

তানভীর তন্ময়কে...

নিজের অজান্তেই যে ছেলেটা আমার মাথায় 'ভুত চাপিয়ে' দিয়েছিলো।

অধ্যায় ১

পুরো শহরকে এখান থেকে ছবির মতো স্পষ্ট লাগছে।

উড়ন্ত কোনো নিশাচর পাখির চোখ দিয়ে আমরা দৃশ্যটা দেখছি। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ভাসছি, বাতাস কেটে ছুটে যাচ্ছি এদিক থেকে ওদিকে। এক নজরে দেখতে শহরটাকে অতিকায় কোনো প্রাণীর মতো লাগছে। না, ঠিক একটা প্রাণী নয়, যেন অনেকগুলো জীবন একসাথে মিশে তৈরি করেছে বিরাট এক অস্তিত্ব। অসংখ্য রাস্তা ধমনীর মতো বইছে এ শহরের শরীরজুড়ে, সেই ধমনীর ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ রক্তকণা। পুরনো-বাতিল যা আছে সব ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে তারা, সে জায়গায় ঝরাচ্ছে নতুনের বর্ষা। দ্রুত গতিবিধি। সেই গতির ভেতর অদ্ভুত এক ছন্দ আছে, অনেকটা বুকের ধুকপুকানির মতো। দপদপ, দপদপ। এই ছন্দের সাথে যেন নাচছে গোটা শহর, কেঁপে উঠছে, মোচড় খাচ্ছে।

মধ্যরাত ঘনিয়ে এসেছে প্রায়। কর্মব্যস্ততা কমে এসেছে, তবে এখনো চঞ্চল সবকিছু। গম্ভীর, নিচু তালে বাজছে জীবনের সুর। একটু একঘেয়ে সেই সুরটা। কখনও ওঠে না, আবার নামেও না কখনও। তবে খেয়াল করে শুনলে টের পাওয়া যায়, এই সুরের চাদরে গা ঢাকা দিয়ে আছে গভীর শঙ্কা, অচেনা এক উদ্বেগ।

ঝলমলে উজ্জ্বল এক এলাকায় এসে থমকে গেলো আমাদের দৃষ্টি। মনোযোগ ছিনিয়ে নিয়েছে এ জায়গা। উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে চোখ সয়ে এলে দেখা দিলো নিয়নের ঢেউ তোলা সমুদ্র। এই এলাকার ডাকনাম হচ্ছে ‘ফূর্তিবাজার’। বিল্ডিংগুলোর গায়ে বসানো বিশাল বিশাল স্ক্রিন। তবে রাতের সাথে আঁধার নেমে এসেছে এই স্ক্রিনগুলোতেও। দোকানের সামনের লাউডস্পিকারগুলোতে হিপ হপ মিউজিকের সুর ঝমঝম করে বেজে চলেছে। একঝাঁক তরুণ-তরুণী ভিড় জমিয়েছে একটা ভিডিও গেমের দোকানের ভেতর। বুনো যান্ত্রিক সুর; বারের ভেতর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রির দল। চুলে সাদা রঙ করা কিশোরীদের মাইক্রো-মিনি স্কার্টের আড়াল থেকে উঁকি মারছে ফর্সা পা।

স্যুট পরা লোকজন শহরতলীর শেষ ট্রেনটা ধরার জন্য যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আড়াআড়ি ফুটপাত ধরে আগাচ্ছে তারা, অনেক তাড়াহুড়ো। ক্লাবের দালালরা গলা ফাটিয়ে কাস্টমার ডাকছে। ঝকঝকে কালো একটা গাড়ি ধীরগতিতে চলছে রাস্তায়, কালো কাঁচের আড়াল থেকে যেন ঠাণ্ডা মাথায় দেখছে সবকিছু। গাড়িটাকে অতল সমুদ্রের কোনো বিচিত্র প্রাণী বলে মনে হচ্ছে, খুব অপরিচিত। গম্ভীর মুখে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে অল্পবয়স্ক দু'জন পুলিশ। কেউ ওদের লক্ষ্য করছে বলে মনে হয় না। গভীর রাতের এই সময় শহরটা তার নিজের নিয়মে চলে। শরতের শেষ এখন। বাতাসের লেশমাত্র নেই, তবে মৃদু একটা শীতল ভাব ছড়িয়ে আছে চারপাশে। শেষ হচ্ছে আরো একটা দিন।

*

আমরা এখন ডেনি'জ নামে একটা খাবারের দোকানে চলে এসেছি।

একদম চোখ-ঝলসানো না হলেও যথেষ্ট আলো আছে এখানে। সে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে নিষ্প্রাণ, প্রায় রঙহীন কিছু চেয়ার-টেবিলের গায়ে। নিচু ভলিউমে গানের সুর বাজছে। এখানকার কর্মিদের ট্রেইনিং দিতে দিতে প্রায় রোবট বানিয়ে ফেলা হয়। কাস্টমারদের প্রতিটা কথার কিভাবে জবাব দিতে হয় সেগুলো নিয়ে বাঁধাধরা নিয়ম আছে দোকানের। কেউ নিয়ম ভাঙলেই চাকরি শেষ। কাস্টমার ঢুকলেই কর্মিদের চেহারায় যান্ত্রিক হাসি ঝুলিয়ে আর কণ্ঠে যান্ত্রিক খুশি ছড়িয়ে বলতে হয়: "ওয়েলকাম টু ডেনি'জ।"

অদ্ভুত একটা রেস্টুরেন্ট। এখানের সবকিছুই কেমন যেন বেনামি। একটা জিনিস বদলে সেখানে একইরকম দেখতে আরেকটা জিনিস রাখলে কেউ বুঝতে পারবে না যে কোনো পরিবর্তন এসেছে। আরো অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে : দোকানের একটা টেবিলও খালি নেই।

এক ঝলকে ভেতরটা দেখে নেয়ার পর, একটা মেয়ের ওপর চোখ আটকে গেলো আমাদের। জানালার পাশে বসে আছে সে। আচ্ছা, এই মেয়েটাই কেন? অন্য কেউ কেন না? বলা কঠিন, তবে কোনো এক বিচিত্র কারণে আমাদের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে ও। একটা বই হাতে চারজনের টেবিলে বসে আছে। পরনে হুডিঅলা ধূসর পার্কা আর নীল জিন্স। পায়ের

হলদে কেড্‌স বারবার ধুতে ধুতে মলিন হয়ে গেছে। একটা জ্যাকেট ঝুলে আছে চেয়ারের পেছনে, সেটাকেও পুরনোই বলা যায়। মেয়েটা সম্ভবত নতুন নতুন কলেজে ঢুকেছে, হাই স্কুলের ঘ্রাণ এখনও গা থেকে ঝাড়তে পারেনি। কালো চুলগুলো ছোট করে কাটা। মেকআপ বলতে খুব সামান্য, কোনো গয়নাও পরেনি। ছোটখাটো লম্বাটে গড়নের মুখ। কালো ফ্রেমের চশমা পরে আছে। একটু পর পর ভ্রুজোড়ার ফাঁকে ভাঁজ হয়ে ফুটে উঠছে অস্থিরতার ছাপ।

গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে মেয়েটা, মোটাসোটা হার্ডকভার বইয়ের পাতা থেকে চোখ সরছেই না বলা যায়। বুকস্টোরের মোড়কের আড়ালে ঢাকা পড়ায় বইয়ের নামটা আমরা বুঝতে পারছি না। তবে ওর চোখে-মুখে ফুটে ওঠা অভিব্যক্তি থেকে আন্দাজ করা যায় যে এটা হালকা রোমাঞ্চ উপন্যাস টাইপের বই না। আরো সিরিয়াস কিছু নিয়ে লেখা। এক একটা লাইন যেন সময় নিয়ে চিবোচ্ছে মেয়েটা, আস্তে আস্তে বুঝছে।

টেবিলে একটা কফির কাপ রাখা। পাশে একটা অ্যাশট্রে। অ্যাশট্রের ধারেই একটা নেভি ব্লু রঙের বেসবল ক্যাপ দেখা যাচ্ছে। জিনিসটা বোধহয় ওর মাথায় তুলনায় বড়ই হবে। পাশের সিটে একটা বাদামি রঙের পেটমোটা চামড়ার ব্যাগ রাখা। দেখে মনে হয় খুব তাড়াহুড়া করে ঠেসেঠুসে একগাদা জিনিস ঢোকানো হয়েছে ভেতরে। কিছুক্ষণ পর পর কফির কাপটা ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছে ও, তবে স্বাদটা ভালো লাগছে বলে মনে হয় না। হাতের সামনে কফির কাপ থাকায় বাধ্য হয়ে চুমুক দিতে হচ্ছে; কফিশপে যখন ঢুকেছে কাস্টমারের ভূমিকায় তো অভিনয় করতে হবেই!

ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে দিলো মেয়েটা, প্লাস্টিকের লাইটার দিয়ে আগুন ধরালো। চোখ সরু করে সহজ ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়লো বাতাসে। তারপর নির্দ্বিধায় অ্যাশট্রেতে নামিয়ে রাখলো সিগারেট। কপালের দু'পাশে আঙুল রেখে আলতো করে চাপ দিলো; মাথাব্যথা হলে আমরা যে কাজটা করি আর কি।

নিচু ভলিউমে যে গানটা বাজছে, তা হলো 'গো অ্যাওয়ে লিটল গার্ল।' পার্সি ফেইথ আর তার ব্যান্ডের গাওয়া গান। কারো সেই গানের দিকে মনোযোগ নেই। এ মাঝরাতে অদ্ভুত সব মানুষ এসে জড়ো হয়েছে ডেনি'জে। খাবার আর কফি নিয়ে ব্যস্ত সবাই। তবে মেয়ে এখানে একজনই। বই থেকে চোখ সরিয়ে একবার হাতের দিকে তাকালো ও।

ঘড়ির কাঁটার আলসেমি দেখে বিরক্ত হলো কিছুটা। সে অবশ্য কারো অপেক্ষায় বসে নেই, আশেপাশে না তাকিয়ে একমনে বই পড়ে যাচ্ছে শুরু থেকেই। হঠাৎ হঠাৎ একটা সিগারেট ধরাচ্ছে, ঠেলে সরিয়ে রাখছে কফির কাপ। মনে মনে চাইছে যে সময় কাটুক আরো দ্রুত। তবে ভোর হতে এখনো অনেক, অনেক দেরি।

বই পড়ায় ক্ষান্ত দিয়ে বাইরে তাকালো মেয়েটা। দোতলার জানালা দিয়ে নিচের ব্যস্ত রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। সময়টা মাঝরাত, তবুও আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। নির্বিকার চিত্তে আসা-যাওয়া করছে লোকজন। কেউ ফিরছে গন্তব্যে, কারও আবার কোনো গন্তব্যই নেই; এক বুক আশা নিয়ে অথবা নিরাশাকে আঁকড়ে ধরে পথ চলছে তারা। পথচারীদের অনেকেই হয়তো সময়কে হাতের মুঠোয় কব্জা করে রাখতে চায়, ঠিক তেমনি সময়ের আগে ছুটে চলতে থাকা মানুষেরও অভাব নেই। এই ছোট্ট জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেটে গেলো অনেকটা সময়। জমে থাকা দীর্ঘশ্বাস আঁকড়ে রেখে আবার বইয়ের পাতায় হারিয়ে গেলো মেয়েটা। কফির কাপের দিকে হাত বাড়ালো আনমনে। দু'-তিনবার টানা সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ছাই হয়ে পড়ে রইলো।

*

ইলেকট্রিক ডোর খুলে যেতেই হ্যাংলাপাতলা একটা ছেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। গায়ে কালো চামড়ার কোট, জলপাই রঙের একটু কুঁচকানো সুতির প্যান্ট আর খয়েরি বুট। মাথায় বেশ লম্বা চুল, কয়েক জায়গায় প্যাঁচ লেগে আছে। কয়েকদিন গোসল করার সুযোগ পায়নি বোধহয়। আবার এমনও হতে পারে যে এমন উসকো-খুসকো হয়ে চলতেই তার ভালো লাগে। লিকলিকে তালপাতার সেপাই গোছের স্বাস্থ্যের কারণে ওকে খুব একটা অভিজাত বলে মনে হয় না। কাঁধ থেকে ঝুলছে স্ট্র্যাপ লাগানো একটা কালো রঙের বক্স। ভেতরে বড় বাঁশি জাতীয় কিছু একটা থাকার কথা। আরেক হাতে একটা নোংরা ব্যাগ ধরে রাখা। দেখে মনে হচ্ছে ভেতরে মিউজিক শিট থাকতে পারে। ছেলেটার মুখের ডানপাশে একটা ক্ষতচিহ্ন আছে, ছোটখাটো হলেও বেশ গভীর; চোখ যেতে বাধ্য। যেন খুব ধারালো কিছু একটা দিয়ে মাংস খুবলে নেয়া হয়েছিলো সেখান থেকে। ব্যস,

এটুকুই। আর তেমন কিছু বলার নেই ওর সম্পর্কে। একেবারে সাদামাটা দেখতে যুবক, বেশি স্মার্ট না, বেশি খ্যাত বলেও মনে হয় না।

ওয়েট্রেসের নির্দেশনায় রেস্টুরেন্টের পেছনের একটা সিটের দিকে আগালো সে। ওদিকেরই আরেকটা টেবিলে একটা মেয়ে বই হাতে বসে আছে। টেবিল পেরিয়ে কয়েক পা আগাতেই কী যেন ভেবে থমকে দাঁড়ালো ছেলেটা। সিনেমার দৃশ্যকে রিওয়াইন্ড করার মতো ধীরপায়ে ফিরে গেলো সেই টেবিলটার কাছে। ভালো করে মেয়েটার চেহারা দেখলো কিছুক্ষণ, যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করছে। ছেলেটাকে দেখে আন্দাজ করা যায় যে ওর একটু আলসেমী করার অভ্যাস আছে।

অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথির উপস্থিতি টের পেয়ে বই থেকে চোখ সরালো মেয়েটা, ভ্রু কুঁচকে তাকালো রোগা ছেলেটার দিকে। চোখাচোখি হতেই হেসে ফেললো ছেলেটা। সেই হাসির একটাই মানে: 'আমাকে দেখে চমকানোর কিছু নেই'।

*

"ভুল করে থাকলে আগেই সরি বলে নিচ্ছি," বলল সে, "কিন্তু তুমি এরি আসাইয়ের ছোট বোন না?"

মেয়েটা উত্তর দিলো না। এমনভাবে তাকালো যেন বাগানের কোনায় পড়ে থাকা আগাছার ঝোপ দেখছে।

"আগে একবার দেখা হয়েছিলো আমাদের," ছেলেটা বলতে লাগলো। "তোমার নাম... ইয়ুরি, তাই না? প্রথম অক্ষর বাদ দিলে নামটা তোমার বোনের মতোই শোনায়।"

সতর্ক দৃষ্টি বজায় রাখলো মেয়েটা, এক কথায় শুধরে দিল ওকে: "মারি।"

তর্জনী উঁচিয়ে বলল ছেলেটা: "আরে, হ্যা! মারি। এরি আর মারি। প্রথম অক্ষরটা শুধু আলাদা। এটা মনে ছিলো। আমাকে চিনতে পারোনি বোধহয়, তাই না?"

মারি সামান্য মাথা কাত করলো। এর অর্থ হ্যা বা না–দুটোই হতে পারে। চশমা খুলে কফির কাপের পাশে রেখে দিলো।

পাশে ওয়েট্রেস অপেক্ষা করছিলো। সে কিছুটা ইতস্তত করে জানতে

চাইলোঃ “আপনারা কি একসাথে বসবেন?”

“হুঁ,” উত্তর দিলো সে। “একসাথেই।”

ওয়েট্রেস টেবিলের ওপর মেন্যু নামিয়ে রাখলো। ছেলেটা ততোক্ষণে মারির উল্টোদিকের সিটে বসে পড়েছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে চিন্তা করলো কী যেন, তারপর জিজ্ঞেস করলো, “এখানে বসলে তোমার অসুবিধা নেই তো? খাওয়া শেষ করেই উঠে চলে যাবো। একজনের সাথে দেখা করতে হবে আমার।”

মারির ভ্রু সোজা হয়নি এখনো। “সেই কথাটা কি বসার আগে বলে নেয়া উচিত ছিলো না?”

ছেলেটা ওর কথার মানে বোঝার চেষ্টা করলো। “কোনটা? আমি একজনের সাথে দেখা করতে যাবো?”

‘না...” মারি বলল।

“ওহ্ আচ্ছা, এখানে যে বসতে চাইলাম সেটা?”

“হুঁ।”

মাথা নাড়লো ছেলেটা। “তা ঠিক। এখানে বসার আগে তোমাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো। সরি। এতো ভিড় এখানে! অবশ্য বেশিক্ষণ জ্বালাবো না তোমাকে। রাগ করলে নাকি?”

মারি আলতো করে কাঁধ ঝাঁকালো, যার মানে দাঁড়ায়, ‘সমস্যা নেই।’

মেন্যু হাতে নিয়ে চোখ বুলালো ছেলেটা। জিজ্ঞেস করলো, “তোমার খাওয়া শেষ?”

“আমার খিদে নেই।”

আবার মেন্যু দেখায় মনোযোগ দিলো সে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারপর টেবিলে নামিয়ে রাখলো। “মেন্যু খোলার কোন দরকার ছিলো না আসলে। একটু নাটক করলাম।”

মারি কিছু বলল না।

“এখানকার চিকেন সালাদ বাদে আমি আর অন্য কিছু খাই না। কখনোই না। ডেনি'জে খাবার মতো কী আছে জানতে চাইলে শুধু এই চিকেন সালাদের কথাই বলবো। অন্য সবকিছু টেস্ট করে দেখেছি, কোনোটাই তেমন জমে না। ভালো কথা, ওদের চিকেন সালাদটা খেয়ে দেখেছো?”

মারি মাথা ঝাঁকালো।

"খারাপ না কিন্তু। চিকেন সালাদ আর মচমচে টোস্ট। ডেনি'জে আমার খাবার বলতে এই দুটোই।"

"তাহলে মেন্যু দেখলে কেন?"

আঙুল দিয়ে চোখের কোনার ভাঁজগুলো ডলতে লাগলো ছেলেটা। "জানি না, ব্যাপারটা কেমন যেন একটু মন খারাপ করা লাগে আমার। ডেনি'জে একজন এতোবার এসেছে যে পুরো মেন্যু মুখস্থ হয়ে গেছে। এটা কি সবাইকে জানানোর মতো কিছু? এজন্য প্রতিবার ভেতরে ঢুকে মনোযোগ দিয়ে মেন্যু উল্টাই। এমন ভাব করি যেন অনেক ভেবেচিন্তে তারপর চিকেন সালাদ অর্ডার করেছি।"

পানির বোতল নিয়ে এলো ওয়েট্রেস। ছেলেটা চিকেন সালাদ আর মচমচে টোস্ট অর্ডার করলো। "বেশি মচমচে হয় যেন," বুঝিয়ে দিলো ওকে, "পোড়া পোড়া হলে অসুবিধা নেই।" তারপর বলল খাবার শেষ করার পর কফি দিয়ে যেতে। হাতে ধরে রাখা ছোট্ট একটা যন্ত্রে অর্ডারগুলো টুকে নিলো ওয়েট্রেস, নিশ্চিত করার জন্য পড়ে শোনালো একবার।

"আরেকটা কথা, আমার সামনে বসা মেয়েটার কাপ খালি পড়ে আছে," মারির কাপের দিকে আঙুল তুলে দেখালো সে।

"ধন্যবাদ, স্যার। আমি এক্ষুনি কফি এনে দিচ্ছি।"

চলে গেলো ওয়েট্রেস।

"তুমি মুরগি পছন্দ করো না?'

"না, ব্যাপারটা তা না," মারি উত্তর দিলো। "তবে বাইরে গেলে মুরগি না খাওয়ার চেষ্টা করি।"

"কেন?"

"চেইন রেস্টুরেন্টগুলোতে যে মুরগি রান্না করা হয় সেগুলোকে নানারকম ওষুধ খাওয়ায় ওরা। গ্রোথ হরমোন। বড় বড় অন্ধকার খাঁচার ভেতর মুরগিগুলোকে আটকে রাখা হয়, খাবারের সাথে মেশানো হয় বিষাক্ত কেমিক্যাল। তারপর যন্ত্রের ভেতর ঢুকিয়ে মাথা কেটে ফেলা হয়, চামড়া ছিলে..."

"বাহ! হাসিমুখে বাধা দিলো ছেলেটা। চোখের কোনার ভাঁজগুলো আরও গাঢ় হয়ে গেলো। "এ যে একেবারে চিকেন সালাদের ওপর লেখা মহাকাব্য-"

ওর দিকে চোখ সরু করে তাকালো মারি। তামাশা করছে নাকি?

"যাই হোক। এখানকার চিকেন সালাদ খেতে খারাপ না।"

কথা বলতে বলতে লেদার কোটটা গা থেকে খুলে ফেললো সে, যেন সেটার কথা ভুলেই গিয়েছিলো। পাশের সিটে রেখে দিয়ে হাতের তালু ঘষলো কয়েকবার। ভেতরে একটা গোল গলার সবুজরঙা সোয়েটার পরে আছে ছেলেটা। ওর মাথার চুলের মতোই সোয়েটারের উল কয়েক জায়গায় জট পাকিয়ে আছে। চলাফেরার ব্যাপারে খুব একটা খেয়াল রাখে বলে মনে হয় না।

"শিনাগাওয়াতে একটা হোটেলের সুইমিং পুলে দেখা হয়েছিলো আমাদের। এরপর অবশ্য দুই বছর পেরিয়ে গেছে। মনে পড়ে?"

"একটু একটু।"

"আমার এক বন্ধু ছিলো ওখানে, তোমার বোনও ছিলো। তুমি আর আমিও ছিলাম। আমরা মাত্র কলেজে ঢুকেছি তখন। যতোদূর মনে পড়ে, তুমি তখন হাইস্কুলে পড়তে। সেকেন্ড ইয়ার, তাই না?"

মারি অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো।

"আমার এক বন্ধু তখন তোমার বোনকে ডেট করছিলো। আমাকে ডাবল ডেটে নিয়ে গিয়েছিলো বলতে পারো। তোমার বোন তোমাকে সাথে নিয়ে এসেছিলো। সুইমিং পুলের চারটা টিকেট কিনেছিলো। তুমি পুরো সময়টা পুলেই কাটিয়েছিলে। মুখে তালা দিয়ে ডলফিনের মতো সাঁতরাচ্ছিলে শুধু। পরে আমরা আইসক্রিম খেতে গিয়েছিলাম। পিচ ম্যালিবু অর্ডার করেছিলে তুমি।"

মারি সামান্য অবাক হলো। "আপনার এতো কিছু মনে আছে কেমন করে?"

"পিচ ম্যালিবু খাওয়া কোনো মেয়েকে এর আগে ডেট করিনি আমি। আর তাছাড়া, তুমি অনেক কিউট ছিলে তখন।"

মারি নড়েচড়ে বসলো। "মিথ্যুক। পুরো সময় তুমি আমার বোনের দিকে তাকিয়ে ছিলে।" নিজের অজান্তেই আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলো ও।

"তাই?"

মারি নীরবে মাথা ঝাঁকালো।

"থাকতেও পারি। যতোদূর মনে পড়ে, এরি ছোট একটা বিকিনি পরে ছিলো।"

মারি একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটের ফাঁকে ঢুকালো। লাইটার দিয়ে আগুন ধরিয়ে নিলো।

"একটা কথা বলি তোমাকে," ছেলেটা বলল। "ডেনি'জের পক্ষ নিয়ে বলছি না। এক প্লেট চিকেন সালাদের চেয়ে কিন্তু এক প্যাকেট সিগারেট অনেক বেশি ক্ষতি করে। না? তোমার কী মনে হয়?"

মারি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো।

"আমার বোনের সাথে অন্য একটা মেয়ের যাবার কথা ছিলো সেদিন। একেবারে শেষ মিনিটে সে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলো। জোর করে আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। জোড়া মেলানোর জন্য আর কি!"

"তোমার মেজাজ খারাপ ছিলো তাহলে-"

"আমার কিন্তু তোমার কথা মনে আছে।"

"তাই?"

উত্তর না দিয়ে গালের ওপর আঙুল ছোঁয়ালো মারি।

ইশারা বুঝতে পেরে নিজের গালের সেই গভীর ক্ষতচিহ্নের ওপর হাত রাখলো ছেলেটা। "এটার কথা জানতে চাইছো? বাচ্চাকালে আমার খুব জোরে সাইকেল চালানোর বদভ্যাস ছিলো। একদিন পাহাড়ের নিচে চালানোর সময় মোড় ঘুরতে গিয়ে তাল সামলাতে পারিনি। আর এক ইঞ্চি হলেই যেতো ডান চোখটা। আমার কানের লতিরও বারোটা বেজেছে ওই ঘটনায়। দেখতে চাও?"

মারি ভ্রু কুঁচকে মাথা নাড়লো।

চিকেন সালাদ আর টোস্ট নিয়ে হাজির হলো ওয়েট্রেস, সযত্নে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। মারির কাপে কফি ঢালার পর নিশ্চিত হয়ে নিলো সবকিছু ঠিকঠাক মতো আনা হয়েছে কিনা। দক্ষ হাতে ছুরি আর কাঁটাচামচ চালাতে শুরু করলো ছেলেটা। চিকেন সালাদ খাবার পর একটা টোস্ট তুলে নিয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বিরক্তি ফুটে উঠেছে চেহারায়।

"বারবার বললাম আমার টোস্টটা শক্ত করে ভেজে দিতে। কে শোনে কার কথা! এখন পর্যন্ত একবারও যেমন চাই তেমন দিতে পারলো না। একটা টোস্ট বানানো এতো কঠিন নাকি? কেন পারবে না ওরা? খুব সভ্য

হয়েছি আমরা। বড় বড় শহর বানিয়েছি, গাড়ি নামিয়েছি রাস্তায়। কিন্তু কাস্টমারের কথা শুনে যদি একটা টোস্ট-ই না বানানো যায়, তবে সেই সভ্যতার কোনো দাম আছে?"

মারি পাত্তা দিলো না ওর কথাগুলোকে।

"যা বলছিলাম, তোমার বোন বেশ সুন্দরি ছিলো-"

মারি চোখ বড় করে তাকালো। "ছিলো মানে?"

"ছিলো মানে...ইয়ে...আমি আসলে অনেক আগের কথা বোঝানোর জন্য বলেছি। ঘটনাটা পুরনো তো, এজন্য আর কি। আমি কিন্তু বলিনি যে ও এখন আর সুন্দর নেই।"

"ও এখনও বেশ সুন্দরি। আমি তাই মনে করি।"

'তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি। এরি আসাইকে আমি তেমন ভালোভাবে চিনি না। ও আর আমি হাইস্কুলে এক বছর একই ক্লাসে ছিলাম। কিন্তু দু'-একবারের বেশি কথা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। আরও পরিষ্কার করে বলতে চাইলে, আমাকে দেয়ার মতো সময় ছিলো না ওর।"

"তোমার এখনো ওকে নিয়ে ভালোই ইন্টারেস্ট আছে, না?"

ছুরি আর কাঁটাচামচ উঁচিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলো ছেলেটা। একটু ভেবে বলল : "ইন্টারেস্ট। হ্যা, বলতে পারো। তার চেয়ে কৌতুহল বেশি।"

"কৌতুহল? একটু কঠিন হয়ে গেলো না কথাটা?"

"হ্যা। জানতে ইচ্ছে করতো, এরি আসাইয়ের মতো এতো সুন্দরি একটা মেয়ের সাথে ডেটে যেতে কেমন লাগবে? এমন মেয়ে তো শুধু ম্যাগাজিনের কভারে দেখেছি!"

"এই? এটা নিয়ে তোমার কৌতুহল?"

"হ্যা, অনেকটা তাই।"

"কিন্তু এরি তো তখন তোমার বন্ধুর সাথে প্রেম করছিলো। তুমিই বরং ডাবল ডেটে হাজির হয়েছিলে।"

চুপচাপ মাথা নাড়লো ছেলেটা, মুখে একগাদা খাবার। ধীরেসুস্থে চিবোতে লাগল।

"আমি একটু নিরামিষ টাইপের মানুষ। এতো শোঁ-শাঁ আমার সাথে যায় না। আমি হচ্ছি সালাদ, সাইড ডিশ। সবকিছুতেই সাইডে থাকি।"

“সেজন্যই তোমাকে আমার সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিলো।”

“কী যে বলো, তুমি অনেক কিউট একটা মেয়ে ছিলে।”

“ছিলাম! সবসময় শুধু আগের কথা বলো কেন? এখন কী?”

হাসলো ছেলেটা। “নাহ, আমি আসলে ওই সময়ের কথা ভাবছিলাম তো। মানে, তখন আমার যা যা মনে হয়েছিলো আর কি। তুমি সত্যিই অনেক কিউট ছিলে। অবশ্য আমার সাথে তেমন কথাই বলোনি সেদিন।”

প্লেটের ওপর কাঁটাচামচ আর ছুরি নামিয়ে রাখলো ও। এক চুমুক পানি খেয়ে টিস্যু দিয়ে মুখ মুছলো। “তুমি যখন সাঁতার কাটছিলে তখন এরিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘তোমার ছোট বোন আমার সাথে কথা বলছে না কেন? আমাকে দেখে বিরক্ত হয়েছে?’”

“ও কী বলেছিলো?”

“তুমি নাকি আগ বাড়িয়ে কারও সাথে কথা বলো না, আর দশটা মেয়ের চাইতে আলাদা তুমি। জাপানি হওয়ার পরেও জাপানিজের চেয়ে চাইনিজে কথা বলো বেশি। তাই আমাকে চিন্তা করতে নিষেধ করেছিলো। বলেছিলো আমাকে দেখে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই।”

নীরবে অ্যাশট্রেতে ঘষে সিগারেট নেভালো মারি।

“সত্যিই কি তাই? আমাকে দেখে বিরক্ত হওনি তখন। নাকি হয়েছিলে?”

মারি একটু চিন্তা করলো। “আমার অতোকিছু মনে নেই। তবে তোমাকে দেখে বিরক্ত হয়েছি বলে মনে হয় না।”

“যাক! চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। মানছি আমার কিছু সমস্যা আছে, তবে সেই বিষয়গুলো আমি নিজের ভেতর ধামাচাপা দিয়ে রাখি। কেউ সেটা বুঝে ফেললে খুব লজ্জা লাগে। আর ওইরকম সুন্দর একটা দিনে, সুইমিং পুলের মতো সুন্দর জায়গায় এমনটা ঘটলে তো আরও সাংঘাতিক।”

মারি এবার গম্ভীর চেহারায়, সিরিয়াস সুরে বলল: “তোমার মনের ভেতর চাপিয়ে রাখা কোনোকিছু আমি বিন্দুমাত্র আন্দাজ করতে পারিনি।”

“শুনে খুশি হলাম, ম্যাডাম।”

“তোমার নামটা মনে নেই যদিও,” মারি বলল।

“আমার নাম?”

"হুঁ, তোমার নাম।"

মাথা ঝাঁকালো ছেলেটা। "নাম ভুলে গেলে আমি মন খারাপ করি না। আমার নামটা তেমন আহামরি কিছু না এমনিতেও। মাঝে মাঝে মনে হয় নিজেই ভুলে যাবো। অবশ্য নিজের নাম ভুলে যাওয়া বেশ কঠিন কাজ। তবে অন্যদের নাম আমার খুব একটা মনে থাকে না-যতোই দরকারি হোক-প্রায়ই ভুলে যাই।"

উদাস ভঙ্গিতে জানালার দিকে তাকালো ও, যেন খুব দরকারি কিছু একটা খুঁজছে। তারপর ঘুরে বসলো মারির দিকে।

"আচ্ছা, ওইদিন একটা জিনিস দেখে অবাক হয়েছিলাম। তোমার বোন পুলে নামলো না কেন? অনেক গরম ছিলো তখন, আর পুলটা কতো সুন্দর তুমি নিজেই তো দেখেছো।"

মারি ওর দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। যেন চোখের ভাষায় বলছে: তুমি এই সামান্য ব্যাপারটাও বোঝোনি? "এরি ওর মেকআপ নষ্ট করতে চায়নি। আর ওইটুকু সুইম স্যুট পরে সাঁতরানো যায় না।"

"তাই নাকি? আজব তো। আপন দুই বোন এতো আলাদা হয় কীভাবে?"

"আমাদের লাইফ অনেক আলাদা যে।"

একটু চিন্তা করে আবার বলতে লাগলো ছেলেটা। "মাঝে মাঝে আমি ভাবি, সবার জীবন কীভাবে আলাদা হয়ে যায়! তোমার আর তোমার বোনের কথাই ধরা যাক। একই বাবা-মা জন্ম দিয়েছে তোমাদের। দু'জনই মেয়ে, বড় হয়েছো একই বাড়িতে। তারপরও তোমরা এতো অন্যরকম। কোন সময়টায় এসে তোমরা ঠিক করলে যে আলাদা রাস্তায় যাবে? এক বোন পুলের পারে ছোট্ট বিকিনি পরে বসে থাকে, আরেকজন স্কুলের সুইম স্যুট পরে পানিতে ডলফিনের মতো ঝাঁপিয়ে বেড়ায়!"

"তুমি আমার কাছে সেটার ব্যাখ্যা চাইছো? এখন বসে বসে আমি পঁচিশ শব্দের মাঝে সবকিছু বুঝিয়ে বলব, আর তুমি চিকেন সালাদ খাবে?"

ছেলেটা মাথা ঝাঁকালো। "আরে নাহ্, আমার যে ব্যাপারটা অবাক লাগে সেটা বললাম। তোমার বলতে হবে না, আসলে নিজেকেই জিজ্ঞেস করেছি।" আবার চিকেন সালাদ মুখে দিয়ে প্রসঙ্গ বদলালো সে। "আমার কোনো ভাই-বোন নেই। এজন্য এই ব্যাপারে আগ্রহ বেশি। কতোদিন

পর্যন্ত একসাথে বেড়ে ওঠা ভাই-বোনের মিল থাকে, আর কখনই বা হুট করে তারা বদলে যায়?"

মারি চুপ করে রইলো। ছেলেটা একদৃষ্টিতে টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে। কাঁটাচামচ আর ছুরিটা ধরে রেখেছে স্থির হাতে।

"হাওয়াই দ্বীপে হারিয়ে যাওয়া তিন ভাইয়ের একটা গল্প পড়েছিলাম একবার," অবশেষে নীরবতার অবসান ঘটলো। "অনেক পুরনো, রূপকথার গল্প। বাচ্চাকালে পড়েছিলাম তো, পুরোটা সেভাবে মনেও নেই। গল্পটা এরকম: তিন ভাই মিলে মাছ ধরতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে। সাগরে ভাসতে ভাসতে একসময় তারা নির্জন দ্বীপে এসে হাজির হয়। জায়গাটা খুব সুন্দর; চারদিকে বড় বড় নারিকেল আর হাজার রকমের ফলগাছ। দ্বীপের ঠিক মাঝামাঝি বিশাল এক পাহাড়। টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তিনজন, ধীরে ধীরে রাত নেমে আসে। স্বপ্নে এক দেবতার দেখা পায় ওরা। দেবতা বলেন, 'সৈকত থেকে সামান্য দূরে হেঁটে গেলে তিনটা বড় বড় পাথরের চাঁই পাবে তোমরা। আমি চাই, প্রত্যেকে সেই পাথরের চাঁইগুলোকে নিজেদের ইচ্ছামতো দূরে ঠেলে নিয়ে যাবে। তবে একটা কথা, যে যেখানে থামবে, সেখানেই তার চিরকাল থাকতে হবে। পাহাড়ের যতো ওপরে উঠতে পারবে, ততো বেশি উপভোগ করতে পারবে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য। কে কতোদূর পাথর ঠেলতে চাও, সেটা পুরোপুরি তোমার নিজের ইচ্ছা।'"

পানির গ্লাসে চুমুক দিলো ছেলেটা। মারি'র চোখে-মুখে অনাগ্রহের ছাপ, তবে গল্পটা মনোযোগ দিয়েই শুনেছে এতোক্ষণ।

"এতোদূর পর্যন্ত তো বোঝাতে পেরেছি, না?"

মারি মাথা ঝাঁকালো।

"বাকিটা শুনতে চাও? বিরক্ত লাগলে আর বলবো না।"

"বেশি বড় না হলে শোনা যায়।"

"না, তেমন বড় না। খুবই সাধারণ একটা গল্প।"

আরেক দফা পানিতে চুমুক দিলো ছেলেটা, তারপর বলতে লাগলো:

"তারপর সেই তিন ভাই সৈকতের দিকে রওনা হলো। দেবতার কথা অনুযায়ী তিনটা পাথরের চাঁই ঠেলতে শুরু করলো ওরা। পাথরগুলো যেমন বড় তেমন ভারী, ঠেলে আগানো এমনিতেই কঠিন। তার ওপর আবার ঢালু পাহাড় বেয়ে উঠতে ওদের ঘাম ছুটে গেলো। প্রথমে হাল ছেড়ে দিলো ছোট

ভাই, বলল, 'ভাইয়েরা, আমার জন্য এই জায়গাটাই যথেষ্ট। তীরের কাছে থাকলে ইচ্ছামতো মাছ ধরতে পারব। বেঁচে থাকার জন্য যা লাগবে সবকিছুই আছে এখানে। পুরো দ্বীপ না দেখতে পেলেও সমস্যা নেই।' অন্য দুই ভাই কিন্তু থামলো না। পাথর ঠেলতে ঠেলতে একসময় পাহাড়ের মাঝ বরাবর এসে পৌছালো তারা। এমন সময় মেঝো ভাই হাল ছেড়ে দিলো। 'আমার জন্য এই জায়গাটাই ঠিক আছে, ভাই। চারদিকে অনেক ফলমূল আর গাছপালা দেখতে পাচ্ছি। আরাম করে জীবন কাটানো যাবে এখানে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নাহয় একটু কমই উপভোগ করলাম।' এরপর বড় ভাই একা একা পাথর ঠেলে ওপরে উঠতে লাগলো। আস্তে আস্তে আরো সরু হয়ে এলো রাস্তা, আরো ঢালু। তবে সে হাল ছাড়লো না। ধৈর্য ধরে আগাতে লাগলো। যেভাবেই হোক চূড়ায় পৌছাতে হবে। এমনি করে মাস পেরিয়ে গেলো। খাওয়া দাওয়ার ঠিক-ঠিকানা নেই, কোনো রেস্ট নেই। অবশেষে একদিন পাহাড়ের চূড়ায় পাথরের চাঁই নিয়ে উপস্থিত হলো সে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চোখ মেলে দেখে নিলো চারদিক। ওপর থেকে প্রকৃতির যে রূপ উপভোগ করা যায়, তা আর কারও চোখে ধরা দেয় না। এখানেই থাকবে ও, সবসময়। ঘাস নেই, পাখি নেই, ফুল নেই–তো কী হয়েছে? তুষার আর শক্ত বরফ চেটে পানির পিপাসা মেটালো ও। খাবার বলতে শুধু শ্যাওলা। তবে কোনো দুঃখ নেই। প্রকৃতির সবটুকু সৌন্দর্য্যকে দু'চোখ ভরে দেখেই বেঁচে রইলো লোকটা। আজ এতোদিন পরেও, হাওয়াই দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় সেই পাথরের চাঁইটা দেখা যায়। গল্পটা এখানেই শেষ।"

ক্ষণিকের নীরবতা।

মারি জিজ্ঞেস করলো, "এই গল্পের কোনো পয়েন্ট আছে?"

"দুটো ধরতে পারো," উত্তর দিলো ছেলেটা। একটা আঙুল উঁচু করে জানালো, "প্রথমত, সব মানুষের চাওয়া-পাওয়া আলাদা। এই কথাটা ভাইবোনদের ক্ষেত্রেও খাটে।" আরেকটা আঙুল তুললো সে, "আর, মন থেকে কোন কিছু চাইলে সেটার দাম দেয়ার জন্য রেডি থাকতে হবে।"

"আমার মনে হয় ছোট দুই ভাই-ই ঠিক করেছে।"

"হ্যা," ছেলেটা সায় দিলো। "এতো কষ্ট করে পাহাড়ে উঠে বরফ আর শ্যাওলা খেয়ে বাঁচার ইচ্ছা কারও থাকার কথা না। তাও, বড় ভাইটার কথা

চিন্তা করে দেখো। লোকটার ইচ্ছা ছিলো সবকিছু দেখবে। যতো কষ্টই হোক, ইচ্ছাটা মিটিয়ে ছেড়েছে। কৌতুহলের জন্য কতোদূরে গেছে।”

“তোমার মতোই কৌতূহল বেশি লোকটার।”

“ঠিক বলেছো।”

মোটা বইয়ের ওপর হাত রেখে মারি পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো।

“আমি যদি জিজ্ঞেস করি কোন বই পড়ছো, বলবে না বোধহয়। ঠিক না?”

“ঠিকই ধরেছো।”

“বইটা বেশ ভারী মনে হচ্ছে।”

মারি কোনো কথা বলল না।

“মেয়েরা সাধারণত এত মোটা বই ব্যাগে নিয়ে চলাফেরা করে না।”

মারি আগের মতোই নিশ্চুপ রইলো। হাল ছেড়ে দিয়ে খাবারের দিকে মনোযোগ দিলো ছেলেটা। চুপচাপ খালি করলো সালাদের বাটি। ধীরেসুস্থে চিবিয়ে গিললো, তারপর এক ঢোকে গ্লাস খালি করলো। আরো কয়েকবার ওয়েট্রেসকে ঢেকে ভরিয়ে নিলো গ্লাসটা। অবশেষে টোস্টের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে খাওয়া-দাওয়ার সমাপ্তি টানলো সে।

*

“আমার যতোদূর মনে পড়ে, তোমাদের বাড়িটা হিয়োশিতে ছিলো,” ছেলেটা বলল। টেবিল থেকে খালি প্লেট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মাথা ঝাঁকালো মারি।

“তার মানে আজ রাতের শেষ ট্রেনটা আর ধরতে পারবে না। বাড়ি ফেরার জন্য এখন আর ট্যাক্সি ছাড়া কোনো উপায় নেই। পরের ট্রেনটা সকালের আগে ছাড়বে না।”

“জানি আমি।”

“হ্যা, তবুও বলছি।”

“তুমি কোথায় থাকো আমি জানি না। তবে তুমিও ট্রেনে ফিরতে পারবে না আর, তাই না?”

“কোয়েনজিতে থাকি আমি, এখান থেকে কাছেই। আমি একাই থাকি।

তাছাড়া আজ সারারাত আমাদের প্র্যাকটিস করার কথা। আর যদি কোনো কারণে বাড়ি ফিরতেই হয়, তাহলে এক ফ্রেন্ড গাড়ি দিয়ে নামিয়ে দেবে।"

ছেলেটা এমন ভঙ্গিতে নিজের ইন্সট্রুমেন্টের বাক্সে আঙুল বোলালো যেন পোষা কুকুরকে আদর করছে।

"এখানে একটা বিল্ডিং আছে, কাছেই। সেখানে আমার ব্যান্ড মিউজিক প্র্যাকটিস করে। বেজমেন্টে। গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও কেউ কিছু বলে না। বছরের এই সময়টায় তেমন কোনো ব্যস্ততা নেই তো, বিল্ডিং-এর মালিক একরকম ফ্রি-তেই প্র্যাকটিস করতে দেয় আমাদের।"

বাদ্যযন্ত্রের কেসটাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলো মারি। "ভেতরে ওটা ট্রম্বোন না?"

"হ্যা! কীভাবে বুঝলে?"

"আজব! ট্রম্বোন দেখতে কেমন সেটা অন্তত জানি আমি।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। তবে আমি লিখে দিতে পারি, ট্রম্বোন নামে যে একধরনের বাঁশি আছে, সেই কথাটাই বেশির ভাগ মেয়ে জানে না। ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই অবশ্য। মিক জ্যাগার কিংবা এরিক ক্ল্যাপটন তো আর ট্রম্বোন বাজিয়ে রকস্টার হয়নি! জিমি হেনড্রিক্স অথবা পিট টাউনসেন্ডকে কখনো স্টেজে উঠে ট্রম্বোন ভাঙতে দেখেছো? না। সুপারস্টাররা ভাঙে গিটার। ট্রম্বোন ভাঙলে বোধহয় দর্শকেরা হেসেই মরে যেতো।"

"তাহলে তুমি এই জিনিস বাজাও কেন?"

কফির কাপে চুমুক দিলো ছেলেটা।

"স্কুলে থাকতে আমি একটা পুরনো ক্যাসেটের দোকান থেকে ব্লুজ-এট নামের একটা ক্যাসেট কিনেছিলাম। জ্যাজ মিউজিকের ক্যাসেট। এই মান্ধাতা আমলের জিনিস কেন কিনেছিলাম জানি না। এর আগে কখনো জ্যাজ মিউজিক শুনিনি। যাই হোক, ক্যাসেটের এ সাইডের প্রথম গানটার নাম ছিলো 'ফাইভ স্পট আফটার ডার্ক।' শোনার পর মোটামুটি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো আমার। গানে ট্রম্বোন বাজিয়েছিলেন কার্টিস ফুলার নামে একজন মানুষ। প্রথমবার শুনে মনে হয়েছিলো, চোখের সামনে সুরটা দেখতে পাচ্ছি। সেইদিন। সেইদিন থেকে মনে হয়েছিলো ট্রম্বোন জিনিসটা আমার বাজানো লাগবে। ভাগ্য নিজে আমাকে কানে ধরে টেনে এনেছে এই

রাস্তায়।"

গুনগুন করে ফাইভ স্পট আফটার ডার্কের প্রথম অংশের সুর শোনানোর চেষ্টা করলো ছেলেটা।

"আমি চিনি এই গানটা।" মারি বলল।

ছেলেটার মুখ হাঁ হয়ে গেলো। "আসলেই?"

মুখে মুখে পরের অংশটুকুর সুর তুললো মারি।

"কীভাবে সম্ভব?"

"কেন? আমার কি এসব শোনা বেআইনি? পুলিশে খবর দেয়া লাগবে?"

কফির কাপ নামিয়ে রেখে আলতো করে মাথা ঝাঁকালো ছেলেটা। "না, একদমই না। তবে সত্যি বলছি, আমার কাছে খুব আজব লাগছে ব্যাপারটা। এই যুগের একটা মেয়ে ফাইভ স্পট আফটার ডার্ক শুনেছে...আচ্ছা, যাই হোক, কার্টিস ফুলার আমার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলো তখন। ঠিক করে ফেলেছিলাম, যেভাবেই হোক ট্রম্বোন শিখব। বাবা-মা'র কাছ থেকে টাকা ধার করে একটা পুরনো ট্রম্বোন কিনেছিলাম কিছুদিন পর। তারপর স্কুল ব্যান্ডে বাজিয়েছি কয়েকদিন। একটা রক ব্যান্ডেও ঢুকেছিলাম, পাওয়ার অফ টাওয়ারের ফ্যান ছিলাম আমরা। তুমি টাওয়ার অফ পাওয়ার চেনো?"

মারি মাথা নাড়লো। চেনে না।

"ব্যাপার না," বলল ছেলেটা। "যা বলছিলাম, শুরুটা রক মিউজিক দিয়েই হয়েছিলো। তবে এখন আমি শুধু জ্যাজ বাজাই। ভার্সিটিতে আমার দারুণ একটা ব্যান্ড হয়েছে।"

পানির গ্লাস আবার ভরিয়ে দেয়ার জন্য এগিয়ে আসছিলো ওয়েট্রেস। হাত নেড়ে ওকে মানা করলো ছেলেটা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "এখান থেকে বের হওয়া উচিত।"

মারি কিছু বলল না। তবে ওর হাবভাবে স্পষ্ট বোঝা যায় মনে মনে বলছে, 'তোমাকে কি কেউ বেঁধে রেখেছে?'

"অবশ্য প্র্যাকটিস আরেকটু রাতের দিকে শুরু হয়।"

এতেও কোনো ভ্রুক্ষেপ করলো না মারি।

"তোমার বোনকে আমার তরফ থেকে হাই দিও, ঠিক আছে?"

“সেটা তো তুমি নিজেই দিতে পারো। আমাদের বাসার ফোন নম্বর আছে তোমার কাছে। আর হাই-টা দেবো কিভাবে? তোমার নামই তো জানি না আমি।”

একটু চিন্তা করলো ছেলেটা। “ধরো আমি ফোন করলাম। এরি আসাই-ই ধরলো। তারপর? কী কথা বলবো ওর সাথে?”

“স্কুলের বন্ধুদের রিইউনিয়নের ব্যাপারে আলোচনা করতে পারো। কত কিছুই তো ভেবে নেয়া যায়!”

“আমি তেমন গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। আগেও পারতাম না।”

“আমার সাথে তো অনেক কথা বললে।”

“তোমার সাথে কথা বলা যায়। জানি না কীভাবে।”

“তোমার সাথে কথা বলা যায়, জানি না কীভাবে,” মারি একটু ভেংচির মতো করে আবার বলল কথাটা। “কিন্তু আমার বোনের সাথে পারো না, তাই না?”

“না, পারবো না বোধহয়।”

“তোমার কৌতূহল এ পর্যন্তই?”

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে রইলো ছেলেটা। কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলো। লম্বা শ্বাস নিয়ে টেবিল থেকে বিলটা তুলে নিলো ও। মনে মনে হিসাব করতে লাগলো তারপর।

“আমার ভাগের টাকাটা রেখে যাচ্ছি। পরে একসাথে দিয়ে দিয়ো?”

মারি মাথা নাড়লো।

একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বইয়ের দিকে দৃষ্টি ফেরালো ছেলেটা। একটু ইতস্তত করে বলল, “আমার নাক গলানো উচিত হবে না। তবুও জিজ্ঞেস করছি, তোমার কোনো ঝামেলা হয়েছে নাকি? বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া অথবা বাবা-মায়ের সাথে গণ্ডগোল? মানে, সারা রাত একা একা একটা খাবারের দোকানে কাটিয়ে দেয়া...”

চশমা পরে নিলো মারি। একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এই শীতল নীরবতাটুকু কেমন যেন অস্বস্তির জন্ম দিলো দু'জনের মাঝে। ছেলেটা দু' হাত তুলে এমন ভঙ্গি করলো যেন এই আচমকা প্রশ্নের জন্য ক্ষমা চাচ্ছে।

“ভোর পাঁচটার দিকে এখানে একবার ঢুঁ মারতে পারি,” বলল ও।

"ওই সময়টায় আমার খিদে পায়। আশা করছি দেখা হবে তখন।"

"কেন?"

"মানে..."

"তুমি কি আমাকে নিয়ে টেনশন করছো?"

"বলা যায়।"

"আমি যেন সুস্থভাবে ফিরে আমার বোনকে হাই দিতে পারি?"

"সেটাও একটা কারণ হতে পারে।"

"একটা ট্রম্বোনের সাথে টোস্টার ওভেনের পার্থক্য কী, আমার বোন সেটাও জানে না। তবে একবার দেখেই ও গুচি আর প্রাডার তফাৎ বলে দিতে পারবে, সেটায় সন্দেহ নেই।"

"আমাদের তো একেকজনের একেক দিকে ঝোঁক থাকে," হাসিমুখে বলল ছেলেটা। কোটের পকেট থেকে নোটবুক বের করে বলপয়েন্ট কলম দিয়ে খসখস করে কিছু একটা লিখলো। তারপর কাগজটা ছিঁড়ে এগিয়ে দিলো মারির দিকে।

"আমার মোবাইল নম্বরটা রেখে দাও। কোন কিছুর দরকার পড়লে ফোন দিও। ভালো কথা, তোমার মোবাইল আছে?"

মারি মাথা ঝাঁকালো।

"যাক," উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল ছেলেটা। "আমি ভেবেছিলাম বলবে এসব হাই-ফাই জিনিস তোমার পছন্দ না।"

চামড়ার কোটটা গায়ে দিলো ও। ট্রম্বোনের বাক্স তুলে নিয়ে পা বাড়ালো দরজার দিকে। ঠোঁটের কোণায় এখনও হাসির রেখা ফুটে আছে। "আবার দেখা হবে।"

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো মারি। কাগজটার দিকে না তাকিয়েই রেখে দিলো টেবিলের এক কোণে, বিলের কাগজটার ঠিক পাশে। এক মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস আটকে চিবুকের নিচে হাত রেখে বসলো ও। কিছুক্ষণ পর আবার হারিয়ে গেলো বইয়ের ভেতর।

রেস্টুরেন্টের ভেতর মৃদু আওয়াজে বেজে চলেছে বার্ট ব্যাখারাখের গান 'দ্য এপ্রিল ফুলস।'

অধ্যায় ২

ঘরটা অন্ধকার, তবে ধীরে ধীরে আমাদের চোখ সয়ে আসছে। বিছানায় একটা মেয়ে শুয়ে আছে, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সুন্দরি এই তরুণী মারি'র বোন, এরি। এরি আসাই। কথাটা কেউ বলে দেয়নি, তবে আমরা জানি। বালিশের ওপর কালো স্রোতের মতো ছড়িয়ে আছে ওর লম্বা চুল।

কিছুক্ষণ মেয়েটাকে দেখলাম আমরা, আমাদের সব মনোযোগ দানা বাঁধলো ওর ওপর। মনে হচ্ছে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছি। বাতাসে ভেসে আছি, কোনো অদৃশ্য ক্যামেরার মতো। এই মুহূর্তে ক্যামেরাটা ঠিক বিছানার ওপর মেয়েটার ঘুমন্ত মুখে ফোকাস করে রাখা। চোখের পলক ফেলতে যতোটা সময় লাগে, ততো দ্রুত বদলে যাচ্ছে ক্যামেরার গতিপথ। এরি আসাইয়ের ঠোঁট সরু, কিন্তু নিখুঁত ঠোঁট। এখন একদম একটা পাতলা লাইনের মতো লাগছে। প্রথম দেখায় মনে হতে পারে ওর নিশ্বাস চলছে না। তবে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকলে গলার নিচের অংশে মৃদু উত্থান-পতন ধরা পড়বে আমাদের চোখে। হ্যা, মেয়েটা শ্বাস নিচ্ছে। বালিশে ওর মাথা রাখার ভঙ্গি দেখে মনে হয় অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। সেটা ভুল অবশ্য। আসলে কিছুর দিকেই তাকিয়ে নেই। শীতকালে আত্মরক্ষার জন্য কিছু ফুলের কুঁড়ি যেমন নিজেদের শক্ত খোলসের ভেতর বন্দী করে ফেলে, অনেকটা সেভাবে শক্ত হয়ে আটকে আছে ওর চোখের পাতা। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সেই দু'চোখে স্বপ্নেরও কোনো ঠাঁই নেই।

কিছুক্ষণ ওকে দেখার পর আমরা একটা সিদ্ধান্তে এলাম। ওর ঘুমটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। অনেক বেশি গভীর, অনেক বেশি নিশ্চিন্ত। মুখের পেশি দূরে থাকুক, চোখের একটা পাঁপড়ি পর্যন্ত নড়ছে না। ফর্সা, সরু ঘাড়টাকে দেখে মনে হচ্ছে পরম যত্নে গড়া কোনো শিল্পকর্ম। ছোট্ট চিবুকের দু'পাশ ধরে বিস্তৃত সুগঠিত চোয়ালের রেখাকে তুলনা করা যায় সাগরের কোল ঘেষা অন্তরীপের সাথে। অসম্ভব ক্লান্তি থাকলেও কেউ এতো নিথড় হয়ে

ঘুমাতে পারে না। নিজের চেতনাকে এভাবে শিথিল করে দেয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে জীবনের সাড়া যেখানে দেখা যাচ্ছে, সেখানে অচেতনতা সাথে সাথে দুশ্চিন্তা জাগায় না। এরি আসাইয়ের নাড়ি এখনো চলছে, শ্বাসও চলছে; তবে ঠিক যতোটুকু না থাকলেই নয় ঠিক ততোটুকু। জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি যদি কোনো সূক্ষ্ম সুতোকে কল্পনা করা যায়, তবে সেই সুতোর ওপরেই সযত্নে ঝুলে আছে মেয়েটার অস্তিত্ব। কীভাবে অথবা কেন এই অবস্থা হয়েছে, সে প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। এরি আসাই ঘুমের এতোটাই গহীন, অভেদ্য একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে মনে হচ্ছে মোমের একটা প্রলেপে ঢেকে গেছে ওর শরীর।

এই ঘরের বাতাসেও কিছু একটা আছে। অস্বাভাবিক কিছু। প্রকৃতির সাথে যেটার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু জিনিসটা কী বোঝা যাচ্ছে না।

পুরো ঘরকে ঘিরে একবার ঘুরে এলো আমাদের দৃষ্টি। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলো। এই ঘরটাকে কোনো দিক থেকেই গোছানো বলা চলে না। যেভাবে সাজানো হয়েছে সেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে না ঘরের মালিক মানুষ হিসেবে কেমন। আগে থেকে না জানলেও এটা বলা যেতো না যে কোনো মেয়ের ঘর। পুতুল নেই, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কোনো কসমেটিকস নেই। পোস্টার কিংবা ক্যালেন্ডারও দেখা যাচ্ছে না। জানালা ঢাকা, পর্দায় সামান্য ফাঁক আছে। পাশেই একটা পুরনো কাঠের ডেস্ক আর সুইভেল চেয়ার। ডেস্কে একটা কালো ল্যাম্প আর নতুন ল্যাপটপ দেখা যাচ্ছে। আর একটা মগ। সেই মগে রাখা নানা রঙের কলম আর পেন্সিল।

দেয়ালের ধার ঘেঁষে একটা সাদাসিধে কাঠের সিঙ্গেল খাট পাতা। ওখানেই শুয়ে আছে এরি আসাই। বিছানার চাদরটা ধবধবে সাদা। উল্টোদিকের দেয়ালের সাথে লাগানো শেলফে একটা স্টেরিও সেট আর গাদা করে রাখা সিডি দেখা যাচ্ছে। তার পাশেই একটা ফোন। আয়না লাগানো একটা ড্রেসিং টেবিলও আছে এই ঘরে। সেই আয়নার সামনে শুধু একটা লিপ বাম আর ছোটখাটো গোল হেয়ারব্রাশ রাখা। ওদিকের দেয়ালে একটা বড় ক্লজেট আছে। এতো বড় যে সেটাকে মোটামুটি আরেকটা ঘর হিসেবেই ধরা চলে। শেলফের ওপরে সারি বেঁধে রাখা পাঁচটা ছোট ছোট ছবির ফ্রেম। ঘর সাজানোর জন্য রাখা হয়েছে এমন জিনিস বলতে শুধু

এগুলোই। সবগুলো ছবিই এরি আসাইয়ের। ও একাই আছে ছবিতে, কোনো বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মডেলিংয়ের উদ্দেশ্যে পেশাদার ফটোগ্রাফার দিয়ে তোলানো হয়েছিলো এই ছবিগুলো, হয়তো কোনো ম্যাগাজিনেও এসেছে। অল্প কয়েকটা বই আছে ঘরে, তার বেশিরভাগ কলেজের পাঠ্যবই। পাশেই অনেকগুলো ফ্যাশন ম্যাগাজিন স্তূপ করে রাখা আছে। এতো ম্যাগাজিন একসাথে দোকানের বাইরে খুব কমই দেখা যায়।

পুরো ঘরের এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। অদৃশ্য, বেনামি, অনধিকার প্রবেশকারীর মতো। আমরা দেখি, শুনি। শুঁকে শুঁকে ঘ্রাণ নিই। কিন্তু আমাদের কোনো ছাপ পড়ছে না এই ঘরে। আমরা সবই পর্যবেক্ষণ করি, কিন্তু কোথাও নাক গলাই না। একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, এ ঘরে যেমন আমাদের ছাপ নেই তেমন এরি আসাইয়ের ছাপও খুব কম। বারবার মনে হচ্ছে কেউ যেন ইচ্ছা করে সব এমন নিষ্প্রাণ করে রেখেছে।

বিছানার মাথার কাছে একটা ডিজিটাল ঘড়ি আছে। নিঃশব্দে সময়ের হিসেব দিচ্ছে সেটা। এই একটা ঘড়ি বাদে ঘরের সবকিছু যেন অচল। নিশাচর, সতর্ক কোনো পশুর মতো লাগছে ঘড়িটাকে। সবুজ রঙের লেখাগুলো জ্বলজ্বল করে সময় বলে দিচ্ছে-

"১১:৫৯।"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা, চিন্তা করলাম। তারপর আবার ভেসে বেড়াতে লাগলাম ঘরের ভেতর। হঠাৎ এসে থামলাম এক জায়গায়। এই ঘরে এখন নীরবতার রাজত্ব। কিন্তু...

টেলিভিশনের দিকে ঘুরলো আমাদের দৃষ্টি, সেদিকে এগিয়ে গেলাম। চারকোণা সনি টেলিভিশনটা ঘরের এক কোণায় রাখা। গায়ের রঙের সাথে মিল রেখে ওটার পর্দাটাও এখন মিশমিশে কালো হয়ে আছে, ঠিক যেন চাঁদের উল্টোপিঠের নিরবিচ্ছিন্ন আঁধার। কিন্তু আমরা কিছু একটা টের পেয়েছি। যেন কিছু শুরু হতে যাচ্ছে। কোনো সাড়াশব্দ না করে আমরা সেই পূর্বাভাসের দিকে মনোযোগ দেয়া শুরু করলাম। আরও বড় হয়ে দৃশ্যটা ধরা দিলো আমাদের চোখে।

কেটে গেছে কয়েকটা মুহূর্ত। দম আটকে শোনার চেষ্টা করছি আমরা।

ঘড়িতে এখন সময় : "০:০০।"

হঠাৎ আমাদের কানে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে এলো, একই সাথে টিভির পর্দায় মিটমিট করে ফুটে উঠলো জীবনের স্পন্দন। কেউ আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘরে ঢুকেছে নাকি? টিভি অন করে দিয়েছে? এসব আধুনিক টিভিতে টাইমার দেয়া যায়, সময়মতো নিজে থেকেই অন বা অফ হয়ে যায়। তেমন কিছু?

না। টিভি'র পেছনদিকে চলে গেছে আমাদের দৃষ্টি। প্লাগই লাগানো নেই! তার মানে সুইচ টিপলেও টিভি চালু হবার কথা নয়। মাঝরাতের শীতল নীরবতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকার কথা ওটার। যুক্তি তো তাই বলে।

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

কয়েকটা রেখা ফুটে উঠেছে টিভির পর্দায়। দাগগুলো ওঠানামা করলো কয়েকবার, ভেঙে গেলো, উধাও হয়ে গেলো। তারপর আবার ফুটে ওঠে আগের মতো। একঘেয়ে যান্ত্রিক শব্দটা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মতো বেজেই চলেছে। ধীরে ধীরে টিভির পর্দায় কিছু একটা নড়তে শুরু করলো। অস্পষ্ট ছবির আকার ধারণ করলো আমাদের চোখের সামনে। সাথে সাথেই বিকৃত হয়ে গেলো আবার। তারপর ফুঁ দিয়ে নেভানোর মতো দপ করে মিলিয়ে গেলো।

আবার শুরু হলো নতুন করে। কাঁপতে কাঁপতে ছবিটা টিভির পর্দায় ফুটে উঠছে, একটু একটু করে রূপ নিতে চাচ্ছে স্থিতিশীল কিছুর। কিন্তু পারছে না। ঝড়ো বাতাসে টিভির অ্যান্টেনা নড়তে থাকলে যেমন ঝাপসা ছবি দেখা যায়, শুধু তেমন দেখা যাচ্ছে। শেষে বিক্ষিপ্ত হয়ে ভেঙে পড়লো সেই কৃত্রিম সম্প্রচার। আমরা তাকিয়ে দেখে গেলাম শুধু।

ঘুমন্ত মেয়েটা এতোক্ষণ কিছুই টের পায়নি। ঘরের ভেতর কী ঘটছে তা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওর। টিভি থেকে ছিটকে আসা আলো অথবা একঘেয়ে শব্দে কিছু যায় আসে না, আগের মতোই সে স্নিগ্ধ ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। এই ঘুম ভাঙানোর সাধ্য আছে কার?

টেলিভিশনটাকে এখন নতুন অনধিকার প্রবেশকারী হিসেবে ধরা যায়। আমরা নিজেরাও তাই। কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে, আমরা নীরব এবং অদৃশ্য। টেলিভিশনটা কিছু একটা করতে চাচ্ছে, আমরা টের পাচ্ছি সেটা।

ছবি আসা-যাওয়া করছে ঠিকই, তবে ধীরে ধীরে আগের চেয়ে স্থির হচ্ছে। টিভির পর্দায় এবার একটা ঘরের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি আমরা।

ঘরটা বেশ বড়সড়, অফিস বা ক্লাসরুম-ও হতে পারে। আকারের সাথে তাল মিলিয়ে জানালাগুলোও বড় বড়, কাঁচের। ছাদে সারি বেঁধে ফ্লুরোসেন্ট লাইট লাগানো। তবে ঘরের ভেতর কোনো আসবাবপত্র নেই। না, কথাটা ভুল! আরেকটু কাছ থেকে দেখতেই ঠিক মাঝখানে একটা চেয়ার খেয়াল করলাম আমরা। সাধারণ একটা কাঠের চেয়ার, কেউ একজন বসে আছে তাতে। ছবিটা এখনো বেশ ঝাপসা। তাই চেয়ারে বসা লোকটাকে এখনো অস্পষ্ট ছায়ার মতো লাগছে। বহুদিনের পরিত্যক্ত কোন ঘরে শীতল বাতাস বইলে যেমন ভ্যাপসা গন্ধ পাওয়া যায়, তেমনটা অনুভব করা যাচ্ছে এই ঘরের ভেতর।

টেলিভিশনের ছবিটাকে আরও নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে চেয়ারের দিকে ফোকাস করে আমাদের ক্যামেরা। চেয়ারে বসা লোকটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। ক্যামেরার দিকে তাকালো সে, চোখেমুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। পরনে গাঢ় রঙের পোষাক, পায়ে চামড়ার জুতো। আমরা লোকটার চেহারা দেখতে পাচ্ছি না। তবে ধারণা করা যায় মাঝারি উচ্চতা আর হ্যাংলা-পাতলা গড়নের হবে। ঘোলাটে ছবি দেখে বয়স বলা অসম্ভব। আর কিছু বোঝার আগেই ছবিটা আবার ভেঙে গেলো। তবে জোড়া লাগতে শুরু করলো পরমুহূর্তেই। ঝিরঝির শব্দটাও থেমে গেলো। টিভির পর্দা এখন পুরোপুরি স্থির।

ঘরের ভেতর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু।

অধ্যায় ৩

ডেনি'জে ফিরে এসেছি আমরা। নিচু ভলিউমে মার্টিনের 'মোর' বাজছে। ত্রিশ মিনিট আগে যতো ভিড় ছিলো, এখন তার চেয়ে অনেক কম। মানুষের গলা আর গল্প প্রায় শোনা যাচ্ছে না বললেই চলে। দেখেই আন্দাজ করা যায় যে রাত আরো গভীর হয়েছে।

মারি এখনো সেই আগের টেবিলে বসে আছে, চোখের সামনে মোটা বইটা খোলা। প্লেটে রাখা ভেজিটেবল স্যান্ডউইচগুলো ছুঁয়েও দেখেনি। খাবার অর্ডার করলে রেস্টুরেন্টে বেশি সময় কাটানো যাবে, তাই ক্ষুধা না থাকা সত্ত্বেও অর্ডার করেছিলো। একটু পর পর বসার ভঙ্গি বদলাচ্ছে মেয়েটা; কখনও টেবিলে কনুই রেখে এক মনে বই পড়ছে, আবার কখনও গা এলিয়ে দিচ্ছে সোফায়। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আবার চোখ তুলে তাকাচ্ছে আশেপাশে, লম্বা শ্বাস নিয়ে দেখছে সবকিছু। তবে মন পড়ে আছে বইয়ের পাতায়। মনোযোগ ধরে রাখার এই ক্ষমতাটা ওর সবচেয়ে বড় গুণগুলোর একটা।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে অনেকেই: কেউ ল্যাপটপে লেখালেখি করছে, কেউবা মোবাইলে মেসেজ টাইপ করতে ব্যস্ত; মারির মতো বই পড়া মানুষেরও কমতি নেই। কিছু না করার দলেও আছে কয়েকজন, জানালার বাইরে তাকিয়ে আনমনে কী যেন ভাবছে। ওদের কারোই বোধহয় রাতে ঘুম হয় না। কে জানে, হয়তো ইচ্ছে করেই ঘুমোয় না। ডেনি'জ যেন একটা দ্বীপ, যেখানে ঝাঁক বেঁধেছে নিশাচর পাখিরা।

বড়সড় সাইজের এক মহিলা হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকলো হঠাৎ। খুব বেশি মোটা বলা যায় না তাকে, তবে শরীরটা যেন নিরেট পাথরের তৈরি। মেয়েদের এতো চওড়া কাঁধ খুব কমই দেখা যায়। চোখ পর্যন্ত নামিয়ে রাখা একটা কালো উলের টুপি পরে আছে সে, গায়ে লেদার জ্যাকেট আর কমলা প্যান্ট। হাতে কিছু নেই। ঢোকার সাথে সাথে প্রায় সবার চোখ ঘুরে গেলো তার দিকে।

ওয়েট্রেস এগিয়ে এলো মহিলার দিকে: "আপনি একাই, ম্যা'ম?" সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে শিকারীর দৃষ্টিতে চারদিকে কী যেন খুঁজতে লাগলো মহিলা। মারির দিকে চোখ পড়তেই হাঁটা দিলো সেদিকে।

টেবিলের কাছে এসে চুপচাপ ওর সামনে বসে পড়লো সদ্য আগত অতিথি। মহিলার শরীর যেমন ভারি, চলাফেরা সে তুলনায় অনেক দ্রুত।

"ইয়ে...বসলাম এখানে,"

বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুললো মারি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো বিশালদেহী মহিলার দিকে।

মাথা থেকে টুপি খুলে ফেললো নবাগত আগন্তুক। সোনালি চুলগুলো নিখুঁতভাবে ছাঁটা উঠোনের ঘাসের মতো দেখাচ্ছে। মুখের অভিব্যক্তি সহজ, স্বাভাবিক। তবে ত্বকটা কেমন যেন রুক্ষ, ছাতার কাপড় অনেকবার বৃষ্টিতে ভেজার পর যেমন হয়ে যায়। প্রথম দেখায় কাঠখোট্টা মনে হলেও সেই চেহারায় একটা ভালোমানুষির ছাপ আছে।

নিজের পরিচয় দেয়ার বদলে মারি'র দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুতভাবে হাসলো মহিলা। মোটা হাতের তালু দিয়ে স্পর্শ করলো কদমছাঁট সোনালি চুল।

এক গ্লাস পানি আর মেন্যু হাতে টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছিলো ওয়েট্রেস। এই কাজটা করতে সে ভালোবাসে মনে হচ্ছে। তবে বিশালদেহী মহিলার হাতের ইশারায় থেমে যেতে হলো ওকে। "লাগবে না, সুইটি।" মহিলা বলল। "আমি এখনই উঠে যাবো।"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে বোকার মতো হাসলো ওয়েট্রেস, উল্টোদিকে ঘুরে গেলো তারপর।

"তুমি মারি আসাই, তাই না?" মহিলা জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, কিন্তু..."

"তাকাহাশি বলল তোমাকে এখানে পাবো।"

"তাকাহাশি কে?"

"তেতসুয়া তাকাহাশি। লম্বা, হ্যাংলা-পাতলা ছেলে। ট্রম্বোন বাজায়।"

মারি মাথা নাড়লো। "আচ্ছা, ও।"

"হ্যা। তাকাহাশি বলল তুমি নাকি ঝরঝরে চাইনিজ বলতে পারো।"

"আসলে," মারি নড়েচড়ে বসলো, "কাজ চালানোর মতো পারি আর

কি। তবে সেটাকে ঝরঝরে বলা যায় না।”

“ওতেই চলবে। আমার সাথে একটু আসতে পারবে? একটা চাইনিজ মেয়েকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছি। সে আবার জাপানিজের ‘জ’ ও জানে না! কী ঝামেলা হয়েছে, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।”

কে এই মহিলা? কী বলছে? মারির কাছে কথাগুলো ঘোলাটে মনে হলো। বুকমার্ক রেখে বইটা বন্ধ করলো ও, ঠেলে সরিয়ে রাখলো একপাশে।

“কীরকম ঝামেলা?”

“ব্যথা পেয়েছে একটু। চিন্তা করো না, জায়গাটা কাছেই, হেঁটে যাওয়া যাবে। তোমার খুব বেশি সময় নষ্ট করব না। ওর কথা শুনে আমাকে শুধু বুঝিয়ে বলবে কী হয়েছে। দোভাষীর কাজ আর কি। আমার অনেক বড় উপকার হবে।”

মারি একটু ইতস্তত করলো। কিছুক্ষণের আলাপেই মহিলাকে ভালো মানুষ মনে হয়েছে ওর কাছে। বইটাকে ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে গায়ে জ্যাকেট চড়ালো। টেবিলে রাখা বিলের দিকে হাত বাড়ানোর আগেই সেটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিলো নতুন অতিথি।

“আমি দিচ্ছি।”

“আরে, নাহ। খাবারগুলো আমার অর্ডার করা।”

“তোমার জন্য এটুকু অন্তত করতেই পারি। চুপচাপ যা করছি করতে দাও।”

দাঁড়ানোর পর দু'জনকে পাশাপাশি একটু অদ্ভুত লাগলো। মারি খুব একটা লম্বা নয়। অন্যদিকে এই মহিলার উচ্চতা ছয় ফুটের কাছাকাছি, দুই কি তিন ইঞ্চি কম হবে হয়তো। বিল দেয়ার ব্যাপারে মারি আর কিছু বলল না।

বেরিয়ে পড়লো দু'জন। রাত গভীর হয়েছে, তবে রাস্তায় মানুষ আছে এখনো। ভিডিও গেমের দোকানগুলো থেকে যান্ত্রিক শব্দ ভেসে আসছে। ক্যারাওকে ক্লাবের দালালরা হাঁকডাক ছেড়ে খদ্দের যোগাড়ে ব্যস্ত। মোটরসাইকেল এঞ্জিনের গর্জন শোনা যাচ্ছে একটু পর পর। শাটার নামানো একটা দোকানের সামনে বসে আছে তিন যুবক। মারি আর তার সঙ্গিনীকে দেখে ওরা বড় বড় চোখ করে তাকালো। গতিবিধি লক্ষ্য করলো কিছুদূর

পর্যন্ত, তবে কিছু বলল না। দোকানের বন্ধ শাটারে স্প্রে-পেইন্ট দিয়ে নানা আঁকিবুঁকি করা।

"আমার নাম কাওরু," মহিলা বলতে শুরু করলো, "তুমি বোধহয় ভাবছ, এই বিদঘুটে মহিলা এতো সুন্দর ছোট্ট একটা নাম পেলো কোথায়? সত্যি বলছি, নামটা আমার বাবা-মায়ের দেয়া।"

"নাইস টু মিট ইউ," মারি হাসলো।

"এভাবে হুট করে তোমাকে টেনে আনার জন্য সরি। কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না।"

কী বলবে বুঝতে পারলো না মারি। চুপ করে থাকাই ভালো।

"ইচ্ছা করলে ব্যাগটা আমাকে দিতে পারো। দেখে অনেক ভারী মনে হচ্ছে,"কাওরু বলল।

"না, সমস্যা নেই।"

"ভেতরে কী আছে?"

"বই, কাপড়-চোপড়..."

"বাড়ি থেকে পালাওনি তো আবার?"

"না।"

"আচ্ছা, ভালো।"

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটলো দু'জন। আলো ঝলমলে অ্যাভিনিউ থেকে একটা সরু গলিতে এসে পৌছালো। ঢালু পথ বেয়ে উঁচুতে ওঠার সময় কাওরু অনেক জোরে হাঁটছিলো, মারি চেষ্টা করলো ওর সাথে তাল রাখতে। নির্জন, জরাজীর্ণ এক সিঁড়ি পেরিয়ে ভিন্ন এক রাস্তায় এসে পড়লো ওরা। সিঁড়িটা বোধহয় দু'টো রাস্তার মাঝে শর্টকাট। নতুন এই রাস্তায় অনেকগুলো দোকানের সাইনবোর্ড জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু কোনোটাতেই মানুষের উপস্থিতি আছে বলে মনে হলো না।

"ওই যে, ওদিকের লাভ হো-টা।"

"লাভ হো?" মারি বুঝতে পারলো না।

"লাভ হোটেল আর কি। প্রেমিক প্রেমিকাদের জন্য ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া দেয়া হয়। নিয়ন সাইনটা দেখতে পাচ্ছ, 'অ্যালফাভিল'? ওটার কথাই বলছি।"

নাম শুনে আবারও কাওরু'র মুখের দিকে তাকালো মারি।

"অ্যালফাভিল?"

"চিন্তা করো না। আমি এখানকার ম্যানেজার।"

"চাইনিজ মেয়েটা কি ভেতরে আছে?"

হাঁটতে হাঁটতে ওর দিকে ঘুরে তাকালো কাওরু। "হুঁ। ব্যাপারটা একটু প্যাঁচালো।"

"ভেতরে তাকাহাশি-ও আছে নাকি?"

"না। তবে কাছেই আরেকটা বিল্ডিংয়ে আছে ও। সারারাত ওরা বেজমেন্টে গানবাজনা করে। স্টুডেন্টদের কতো মজা!"

অ্যালফাভিলের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো ওরা। অতিথিরা এখানে হলঘরে রাখা ক্যাটালগের ছবি দেখে রুম পছন্দ করে। রুম নম্বর অনুযায়ী সাজানো কতগুলো বোতাম আছে, সেখানে চাপতেই চাবি চলে আসে। তারপর লিফটে উঠে সরাসরি নিজের রুমে চলে যাওয়া যায়। কারও সাথে দেখা করা বা কথা বলার প্রয়োজন হয় না। ভাড়ার জন্য দু'রকম ব্যবস্থা আছে: 'রেস্ট' আর 'সারারাত।'

আবছা নীল আলোতে রহস্যময় দেখাচ্ছে সবকিছু। মারির কাছে এ দৃশ্যটা একেবারে নতুন। রিসেপশনে বসা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসলো কাওরু। তারপর মারির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি বোধহয় এরকম জায়গায় কোনোদিন আসোনি।"

"না, এবারই প্রথম।"

"আচ্ছা। পৃথিবীতে যে কতোরকম ব্যবসা আছে!"

লিফটে করে সবচেয়ে ওপরের তলায় উঠলো ওরা। সরু করিডরে হেঁটে যে দরজার সামনে পৌছালো, তার ওপর বড় বড় করে লেখা ৪০৪। কাওরু আলতো করে দু'বার টোকা দিতেই ভেতর থেকে খুলে গেলো দরজাটা। একটা মেয়েকে উঁকি দিলো ভয়ার্ত চোখে। তার চুলগুলো উজ্জ্বল লাল রঙে রাঙানো, কানে অনেকগুলো দুল পরা। এমনিতেই মেয়েটা বেশ রোগা, তার ওপর আবার ঢোলাঢালা বেঢপ সাইজের গোলাপি টি-শার্ট পরেছে। হালের ফ্যাশন অনুযায়ী জিনসের কয়েক জায়গায় বেশ কায়দা করে ছেঁড়া।

"যাক, কাওরু এসেছো!" বলল লালচুলো মেয়েটা। "অনেকক্ষণ লাগালে। আমি আরেকটু হলে পাগল হয়ে যেতাম।"

"কী অবস্থা ওর?"

"আগের মতোই।"

"রক্ত বন্ধ হয়েছে?"

"অনেকটাই। একগাদা টিস্যু পেপার দিয়ে রেখেছি।"

মারিকে নিয়ে ভেতরে ঢোকার পর দরজা আঁটকে দিলো কাওরু। লালচুলো মেয়েটার পাশে আরেকজন ছোটখাটো গড়নের মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। চুলগুলো মাথার ওপরে শক্ত করে বাঁধা। ঘরের মেঝে মোছার কাজে ব্যস্ত সে।

দ্রুত পরিচয় পর্ব সেরে নিলো কাওরু।

"এ হচ্ছে মারি। চাইনিজ বলতে পারে। লাল চুলের মেয়েটার নাম কোমুগি। মানছি, নামটা জাপানিজ ভাষায় 'গমের' মতো শোনায়। কিন্তু কী আর করা, ওর বাবা-মা এই নামই রেখেছে। অনেকদিন ধরে আমাদের এখানে আছে ও।"

মারির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো কোমুগি, "কী অবস্থা?"

"কী অবস্থা?" একই কথা আউড়ে গেলো মারি।

"ঘর মুছছে যে মেয়েটা, ওর নাম কোরোগি। এটা ওর আসল নাম না অবশ্য। নিজেকে 'ঝিঁঝিঁ পোকা' বলে কী মজা পায় কে জানে!"

"সরি," কোরোগি'র কথায় কানসাই অঞ্চলের টান আছে। "আসল নামটা অনেক আগেই ফেলে দিয়েছি।" এই মহিলাকে দেখে কোমুগির কয়েক বছরের বড় মনে হয়।

"কী অবস্থা?" আবারও বলল মারি।

জানালা না থাকায় গুমোট হয়ে আছে ঘরটা। বেঢপ একটা খাট আর টিভি ছাড়া ভেতরে তেমন কিছু নেই। মেঝের এক কোনায় উবু হয়ে বসে আছে একটা মেয়ে, নগ্ন শরীরে তোয়ালে প্যাঁচানো। দুই হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদছে সে। মেঝেতে কয়েকটা রক্তমাখা তোয়ালে পড়ে আছে। বিছানার চাদরেও রক্তের দাগ। উল্টোপাশে একটা টেবিল ল্যাম্প মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। টেবিলের ওপর বিয়ারের আধা খালি বোতল আর একটা গ্লাস রাখা। টিভিতে কোনো একটা কমিডি শো চলছে। দর্শকের হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে সেখান থেকে। কাওরু রিমোট হাতে নিয়ে টিভি বন্ধ করে দিলো।

"দেখে মনে হচ্ছে ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে," মারির দিকে তাকিয়ে বলল

সে।

"যে লোকটা ওকে এখানে নিয়ে এসেছিলো?" মারি জিজ্ঞেস করলো।

"হুঁ, ওর কাস্টমার।"

"কাস্টমার? মেয়েটা প্রস্টিটিউট নাকি?"

"হ্যা, রাতের বেলা এখানে অনেকেই প্রস্টিটিউট নিয়ে আসে," কাওরু বলল। "মাঝেমধ্যে আমরা ঝামেলায় পড়ে যাই। হয়তো মেয়েগুলো টাকার জন্য ঝামেলা করে,

অথবা কাস্টমার উল্টোপাল্টা জিনিস করতে চায়।"

ঠোঁট কামড়ে একটু চিন্তা করে নিলো মারি। তারপর বলল, "ও শুধু চাইনিজ-ই বলতে পারে?"

"হ্যা, জাপানিজে খুব বেশি হলে দু'-একটা শব্দ বলতে পারে হয়তো। আমি পুলিশও ডাকতে পারছি না। মেয়েটার বোধহয় লাইসেন্স নেই। প্রতিবার এতো হাঙ্গামা করার সময় আছে?"

কাঁধের ব্যাগটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো মারি। তারপর মেয়েটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞেস করলো: "নি ঝেনমে লা?" (কী হয়েছে?)

মেয়েটা ওর কথা শুনতে পেলো কিনা কে জানে। উত্তর না দিয়ে আগের মতোই ফোঁপাতে লাগলো।

মাথা ঝাঁকালো কাওরু। "বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে মনে হয়।"

মারি আবার জিজ্ঞেস করলো, "শি ঝংগুয়োরেন মা?" (তুমি কি চায়না থেকে এসেছো?)

এবারও কোনো উত্তর পাওয়া গেলো না।

"ফাংসিন বা, উ গেন জিংছা মেই গুয়াঙ্ঘি।" (ভয় পেয়ো না, আমার সাথে পুলিশের কোনো সম্পর্ক নেই।)

সেই আগের মতোই নীরবতা।

"নি বেই তা দা লা মা?" (কেউ তোমাকে মেরেছে?)

অবশেষে মাথা নাড়লো মেয়েটা, ওর কালো চুল কেঁপে উঠলো।

মারি নিচু স্বরে কথা বলতে লাগলো। বারবার একই প্রশ্ন করার পর হয়তো দু'-একটা উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। তবু হাল ছাড়লো না ও। হাত ভাঁজ করে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে কাওরু। কোমুগিকে ঘর পরিষ্কারের কাজে সাহায্য করছে কোরোগি। রক্তমাখা টিস্যু নিয়ে সেগুলোকে একটা আবর্জনার

ব্যাগে ভরলো ওরা। তারপর বিছানার চাদর তুলে বাথরুমে পরিষ্কার তোয়ালে রেখে এলো। মেঝে থেকে ল্যাম্প তুলে রেখে দিলো আগের জায়গায়। তারপর বিয়ারের বোতল আর গ্লাস সরিয়ে ফেললো। একসাথে কাজ করে অভ্যাস আছে দু'জনের, ছন্দের মিল দেখে সহজেই বোঝা যায়।

মারি এদিকে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছে। পরিচিত ভাষা শুনে একটু শান্ত হয়েছে মেয়েটা। হড়বড় করে চাইনিজ ভাষায় সবকিছু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছে। ভয় অথবা দুর্বলতা যে কারণেই হোক, কণ্ঠে একদমই জোর নেই। মারিকে ওর মুখের কাছে কান পেতে কথা শুনতে হচ্ছে। মাঝে মধ্যে দু'-একটা কথা বলে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে।

পেছন থেকে মারির কাঁধে টোকা দিলো কাওরু। "সরি, এই রুমের জন্য নতুন কাস্টমার অপেক্ষা করছে। ওকে আমরা নিচতলার অফিসঘরে নিয়ে যাবো। চলো, উঠি।"

"কিন্তু ওর গায়ে তো কোনো কাপড় নেই। সেই লোকটা নাকি সবকিছু নিয়ে গেছে- জুতো, আন্ডারওয়্যার- কিছুই রেখে যায়নি।"

কাওরু মাথা ঝাঁকালো। "দৌড়ে গিয়ে যাতে কাউকে না জানাতে পারে, সেজন্য এমন করেছে। কত্তো বড় হারামজাদা!"

ক্লোজেট থেকে পাতলা একটা বাথরোব বের করে মারির দিকে এগিয়ে দিলো কাওরু। "আপাতত এটা পরতে বলো।"

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা, এখনও ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। গায়ে জড়ানো তোয়ালেটা সরাতেই বেরিয়ে পড়লো নগ্ন শরীর। মারি চোখ সরিয়ে নিলো সেদিক থেকে। মেয়েটা ছোটখাটো গড়নের, কিন্তু দেহের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে অপরুপ লাবণ্য। সুডৌল স্তন, কোমল ত্বক, দুই পায়ের মাঝখানে ছায়ার মতো এক চিলতে কেশ। মারি'র বয়সেরই হবে বোধহয়, চেহারায় এখনও খুকী খুকী ভাব রয়ে গেছে।

ঠিকমতো পা ফেলতে পারছে না মেয়েটা। কাওরু ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে ঘরের বাইরে এগিয়ে নিয়ে গেলো। লিফটে উঠলো ওরা। মারি পেছন পেছন অনুসরণ করলো। ইয়োসুগি আর কোরোগি তখনও ঘর পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত।

*

হোটেলের অফিসঘরে ঢুকলো ওরা তিনজন। একগাদা কার্ডবোর্ডের বাক্স দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা আছে। একটা স্টিলের ডেস্ক, সোফা আর কয়েকটা চেয়ার-এই নিয়েই রিসেপশন এরিয়া। ডেস্কের ওপর কম্পিউটার কিবোর্ড আর ঝকঝকে লিকুইড ক্রিস্টাল মনিটর দেখা যাচ্ছে। দেয়ালের সাজসজ্জা বলতে একটা ক্যালেন্ডার, ফ্রেমে বাঁধানো মিতসুয়ো আইদা'র আঁকা নানা ডিজাইনের অক্ষর আর একটা ইলেকট্রিক ঘড়ি। একটা ছোট টিভিও দেখা যাচ্ছে ঘরের কোণায়। মিনি সাইজের একটা ফ্রিজের ওপর মাইক্রোওয়েভ ওভেন রাখা। তিনজনের উপস্থিতিতেই ঘরটা ভরে গিয়েছে। বাথরোব পরা চাইনিজ মেয়েটাকে ইশারায় সোফায় বসতে বলল কাওরু। শক্ত করে কাপড়টাকে গায়ের সাথে জড়িয়ে ধরলো মেয়েটা, বোধহয় শীত করছে।

ফ্লোর ল্যাম্প জ্বালিয়ে সরাসরি মেয়েটার মুখের ওপর আলো ফেললো কাওরু, ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো কোথায় কোথায় আঘাত পেয়েছে। ড্রয়ার থেকে ফার্স্ট-এইড কিট বের করে অ্যালকোহল মাখানো তুলা দিয়ে সযত্নে মুছে দিলো শুকিয়ে যাওয়া রক্ত। কয়েক জায়গায় ব্যান্ড-এইড লাগিয়ে দিলো। তারপর ভালো করে দেখলো নাক ভেঙেছে কিনা। একই সাথে চোখগুলোও দেখে নেয়া হলো; রক্ত জমে থাকলে ক্ষতি হতে পারে। সবার শেষে মেয়েটার চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করলো মাথার কোথাও ফুলে উঠেছে নাকি। কাওরু কাজগুলো এমন সহজ ভঙ্গিতে করলো যেন প্রতিদিনই এসব করতে হয়।

ফ্রিজ থেকে কোল্ড প্যাক করে তোয়ালেতে মুড়িয়ে নিলো সে, তারপর এগিয়ে দিলো চাইনিজ মেয়েটার দিকে। "নাও, মুখে চেপে রাখলে আরাম লাগবে।"

তখনই মনে পড়লো ওর, আরে, মেয়েটা তো জাপানিজ বোঝে না। তারপর ইশারায় বুঝিয়ে দিলো কী করতে হবে। মাথা নেড়ে কোল্ড প্যাকটাকে চোখের নিচে চেপে ধরলো মেয়েটা।

মারির দিকে ঘুরে তাকালো কাওরু। "অনেক রক্ত ঝরেছে, তবে বেশিরভাগই বেরিয়েছে নাক থেকে। কপাল ভালো, সিরিয়াস কিছু হয়নি। মাথায় ফোলা নেই, নাকটাও ভেঙেছে বলে মনে হলো না। চোখের এক কোনা আর ঠোঁট কেটে গিয়েছে, তবে সেলাইয়ের দরকার নেই। অবশ্য

এমন কালশিটে পড়া চোখ নিয়ে প্রায় সপ্তাহখানেক কাজ করতে পারবে বলে মনে হয় না।"

চুপচাপ মাথা নাড়লো মারি।

"লোকটা ভালোই শক্তিশালী, কিন্তু মারামারি করে অভ্যাস আছে বলে মনে হয় না। এলোপাথাড়ি ঘুষি মেরেছে শুধু। বাজি ধরতে পারি, হাতের ব্যথায় কাতরাচ্ছে হারামজাদা। এতো জোরে ঘুষি মেরেছে যে দেয়ালের কয়েক জায়গায় পর্যন্ত দাগ পড়ে গেছে। কোনো হুঁশ ছিলো না মারার সময়, কী করছিলো নিজেও বুঝতে পারেনি।"

কোমুগি ভেতরে ঢুকলো। একটা পরিষ্কার বাথরোব বের করলো দেয়ালের গায়ে ঠেসে রাখা বাক্সের ভেতর থেকে। ৪০৪ নম্বর ঘরের বাথরুমে রেখে আসতে হবে।

"মেয়েটা বলছে," মারি বলল, "সবকিছু নিয়ে গেছে লোকটা-ওর নোটবুক, টাকাপয়সা, মোবাইল ফোন-কিছুই বাদ রাখেনি।"

"বেশ্যাকে টাকা দেবে না, সেই ফন্দি করতে গিয়ে এতোকিছু?" কোমুগি বলল পাশ থেকে।

"না, না, সেরকম না ব্যাপারটা... আসলে কিছু করার আগেই হঠাৎ ওর...মানে...মাসিক শুরু হয়ে যায়। আজকের তারিখে এমনটা হওয়ার কথা নয়। তখনই লোকটা ক্ষেপে গিয়ে..."

"এতে তো ওর কোনো হাত নেই," কোমুগি বলল। "ওই জিনিস শুরু হলে কি আর আটকে রাখা যায়!"

ভ্রু কুঁচকে তাকালো কাওরু, "ঠিক আছে, কোমুগি। অনেক আলাপ হয়েছে। এখন যাও, ৪০৪ পরিষ্কারের কাজটা সেরে ফেলো।"

"ইয়েস, ম্যা'ম। সরি," দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো কোমুগি।

"ঘটনা বুঝতে পেরেছি। লোকটা কাজ করার জন্য রেডি, এমন সময় মেয়েটার পিরিয়ড শুরু হয়। তারপর লোকটার মাথা খারাপ হয়ে যায়, সে মেয়েটাকে মারধর করে। টাকাপয়সা, কাপড়-চোপড়, সবকিছু নিয়ে পালিয়ে যায় এখান থেকে," কাওরু বলল। "পাগল একটা শুওরের বাচ্চা!"

মারি সায় দিলো। "আপনাকে বলতে বলেছে, বিছানার চাদরে যে রক্ত মাখিয়েছে সেটার জন্য ওর খারাপ লাগছে।"

"সমস্যা নেই, আমাদের এসব দেখে অভ্যাস আছে।" কাওরু দীর্ঘশ্বাস

ফেললো। "কেন জানি না, তবে লাভ হোটেলে এসে অনেকেরই মাসিক শুরু হয়ে যায়। ন্যাপকিন বা ট্যাম্পন চেয়ে নিচতলায় খবর পাঠায় ওরা। আমার খুব বলতে ইচ্ছা করে, 'আমাদের এটাকে ওষুধের দোকান পেয়েছ?' কী আর করা! মেয়েটাকে কাপড় পরাতে হবে। এভাবে কোথাও যেতে পারবে না ও।"

আরেকটা বাক্স থেকে এক জোড়া প্যান্টি বের করলো কাওরু। "কমদামি, কিন্তু কাজের। ওকে একটা পরে নিতে বলো। আমি চাই না খামোখা অস্বস্তিতে পড়ুক।"

বলতে বলতে ক্লোজেট থেকে আরেকটা সবুজ রঙের জার্সি বের করলো কাওরু। মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দিলো সেটাও।

"আগে একটা মেয়ে এখানে কাজ করতো। জামাগুলো ওরই। চিন্তার কিছু নেই, এগুলো পরিষ্কার আছে। আর ফেরত দিতে হবে না। আপাতত পরার জন্য এক জোড়া রাবারের স্যান্ডেল দিচ্ছি। খালি পায়ে থাকার চেয়ে সেটা পরে নিক।"

মারি কথাগুলো বুঝিয়ে বলল। এই ফাঁকে একটা ক্যাবিনেট খুলে কয়েকটা স্যানিটারি ন্যাপকিন বের করলো কাওরু।

"নাও, বাথরুমে গিয়ে পরে এসো।" ইশারায় বাথরুমের দরজাটা দেখিয়ে দিলো সে।

অসহায় মেয়েটা মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আরিগাতো," জাপানিজ ভাষায় ধন্যবাদ জানিয়ে পা বাড়ালো বাথরুমের দিকে।

ডেস্ক চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো কাওরু। ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে বলল, "এই ব্যবসায় যে আর কত কিছু দেখতে হবে!"

"ও নাকি মাত্র দুই মাস হলো জাপানে এসেছে," মারি জানালো।

"বেআইনিভাবে, তাই না?"

"ওই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। তবে কথা বলার ভঙ্গি শুনে মনে হলো উত্তরাঞ্চল থেকে এসেছে।"

"পুরনো মাঞ্চুরিয়ার ওদিক থেকে?"

"হতে পারে।"

"হুঁ। কেউ এসে ওকে নিয়ে গেলে হয় এখন।"

"আমার মনে হয় এই ব্যবসায় মেয়েটার বস জাতীয় কয়েকজন

আছে।"

"একটা চাইনিজ গ্যাং," কাওরু ব্যাখ্যা করলো, "প্রস্টিটিউটদের ব্যবসা চালায়। চিনদেশ থেকে মেয়েদের এখানে আসার ব্যবস্থা করে দেয় ওরা, বদলে ভাড়া খাটায়। ফোনে অর্ডার নেয়ার পর মোটরসাইকেলে করে হোটেলে পৌঁছে দেয় মেয়েদের-টাটকা,গরম-পিৎজা ডেলিভারি সার্ভিসের মতো। অবশ্য ওরাই আমাদের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট।"

"গ্যাং বলতে কি ইয়াকুজা'র মতো কিছু বোঝাচ্ছেন?"

কাওরু মাথা ঝাঁকালো। "না, না। আমি একসময় রেসলিং করতাম, বুঝতে? টিভিতে যেমন কুস্তি দেখো না? সেরকম। অনেকবার ন্যাশনাল ট্যুরে গিয়েছি, সেসময় কিছু ইয়াকুজা'র সাথে পরিচয় হয়েছে। একটা কথা বলি, এসব চাইনিজ গ্যাংস্টারদের তুলনায় জাপানি ইয়াকুজারা একেবারে দুধের বাচ্চা। ওরা যে কী চায়, তা নিজেরাও জানে না। আহারে, বেচারি মেয়েটা! কিচ্ছু করার নেই। ওদের কাছে ফিরে না গেলে আর কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকবে না ওর।"

"এই যে আজ রাতে কোনো টাকা পেলো না, এর জন্য কি ওর ওপর চড়াও হবে?"

"তাই তো মনে হয়। এমন কালশিটে পড়া মুখ নিয়ে আরও কয়েকদিন কোনো কাস্টমার পাবে না বেচারি। আর টাকা না কামাতে পারলে বসদের কাছে এক ফোঁটাও দাম নেই। মেয়েটা দেখতে বেশ সুন্দর যদিও..."

জার্সি গায়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো মেয়েটা। বুকে অ্যাডিডাসের লোগো দেখা যাচ্ছে। ওর মুখের অনেক জায়গায় কাটাছেঁড়া আর কালশিটে দাগ পড়ে আছে। তবে চুলগুলো এখন সযত্নে আঁচড়ানো। ফোলা ঠোঁট আর ক্ষতবিক্ষত চেহারা নিয়েও অপরূপ সুন্দরি দেখাচ্ছে।

জাপানিজ ভাষায় জিজ্ঞেস করলো কাওরু, "তুমি কাউকে ফোন করতে চাও, তাই না?"

মারি চাইনিজে অনুবাদ করে দিলো প্রশ্নটা। "ইয়াও দা দিয়ানহুয়া মা?" (টেলিফোনে কথা বলবে?)

মেয়েটা ভাঙা ভাঙা জাপানিজে উত্তর দিলো। "হাআই। আরিগাতো।"

কাওরু ওর দিকে একটা সাদা কর্ডলেস ফোন এগিয়ে দিলো। একটা নম্বরে ডায়াল করে নরম সুরে চাইনিজ ভাষায় কথা বলতে লাগলো মেয়েটা।

ওপাশের মানুষটাকে সংক্ষেপে সবকিছু বুঝিয়ে বলার চুপচাপ কিছুক্ষণ গালিগালাজ শুনলো। তারপর দুই একটা কথা বলে ফোন কাটলো।

কাওরুকে জাপানিজ ভাষায় ধন্যবাদ জানালো সে। “দোমো আরিগাতো।” তারপর মারি'র দিকে ঘুরে বলল, “মাশাং ইয়ু রেন লাই জিয়ে উ।” (কিছুক্ষণের মধ্যে একজন আমাকে নিতে আসছে।)

কাওরুকে কথাটা জানালো মারি। “ওরা মেয়েটাকে নিতে আসছে।”

ভ্রু কোঁচকালো কাওরু। “হোটেলের বিলটা বাকি আছে। সাধারণত কাস্টমাররাই টাকা দেয়। কিন্তু আজকের ওই শুওরটা তো আগেই ভেগেছে। একটা বিয়ারের টাকাও পাই আমরা!”

“মেয়েটাকে যে নিতে আসছে, তার কাছ থেকে টাকা নেবেন?”

“হুম,” কাওরুকে চিন্তিত দেখালো। “দেখি ঝামেলা হয় কিনা।”

বলতে বলতে একটা কাপে চায়ের পাতা নিলো সে। তারপর থার্মোফ্লাস্ক থেকে গরম পানি ঢাললো। তিনটা কাপে সেই চা ঢেলে, একটা এগিয়ে দিলো চাইনিজ মেয়েটার দিকে। ধন্যবাদ জানিয়ে কাপ হাতে নিলো মেয়েটা। গরম চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে ওর কাটা ঠোঁট জ্বলতে শুরু করলো। কপাল কুঁচকে গেলো সাথে সাথে।

চা হাতে নিয়ে চাইনিজ মেয়েটার দিকে তাকালো কাওরু। তারপর জাপানিজ ভাষায় বলল, “তোমার জন্য ব্যাপারটা অনেক কঠিন, তাই না? চায়না থেকে এতোদূর পালিয়ে জাপানে আসা, তারপর এই হারামির দলের অত্যাচার! জানি না বাড়িতে তোমার কেমন কষ্ট হতো। তবে তার চেয়ে এখানে না আসাই ভালো ছিলো বোধহয়, কী বলো?”

“কথাগুলো ওকে বুঝিয়ে বলবো?” মারি জানতে চাইলো।

“না, থাক,” মাথা ঝাঁকালো কাওরু। “আসলে নিজেকেই বলছি।”

আবারও মেয়েটার সাথে কথা বলতে লাগলো মারি। “*নি জি সুই লে?*’ (তোমার বয়স কতো?)

“*শিজিউ।*” (উনিশ।)

“*উও ইয়ে শি। জিয়াও শেনমে মিংযি।*” (আমারও একই বয়স। তোমার নাম কী?)

একটু ইতস্তত করলো মেয়েটা, তারপর উত্তর দিলো, “*গুয়ো ডংলি।*”

“*উও জিয়াও মারি।*” (আমার নাম মারি।)

কথার ফাঁকে একটু হাসলো মারি-সারারাতে এই প্রথমবারের মতো।

অ্যালফাভিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা মোটরসাইকেল, বড়সড় একটা হোন্ডা স্পোর্টস বাইক। চালকের মুখ হেলমেটে ঢাকা। এঞ্জিন চালু করে রেখেই নেমে পড়লো লোকটা, যতো দ্রুত সম্ভব কাজ সেরে বেরিয়ে আসতে চায়। ওর গায়ে একটা আঁটসাঁট কালো লেদার জ্যাকেট। নীল রঙের জিনসের সাথে বাস্কেটবল শু পরেছে, হাতে পুরু গ্লাভস। হেলেমেট খুলে বাইকের গ্যাস ট্যাংকের ওপর নামিয়ে রাখলো সে। চারপাশে একবার ভালোভাবে চোখ বুলিয়ে একটা গ্লাভ খুলে ফেললো। পকেট থেকে মোবাইল ফোন করে দ্রুত ডায়াল করলো একটা নম্বরে। লোকটার বয়স ত্রিশের মতো হবে। চুলে লাল রঙ করা, মাথার পেছনে ঝুঁটি করে বেঁধে রেখেছে। প্রশস্ত কপাল, ভাঙা গাল, চোখজোড়া তীক্ষ্ণ। অল্প কথায় আলাপ সেরে ফোনটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো সে। তারপর গ্লাভস পরে অপেক্ষা করতে লাগলো।

বাইরে বেরিয়ে এলো কাওরু, ডংলি আর মারি। রাবারের স্যান্ডেল পায়ে মোটরসাইকেলের দিকে এগোতে লাগলো চাইনিজ মেয়েটা। বাইরের তাপমাত্রা অনেক নেমে এসেছে, এই জার্সিতে শীত মানার কথা নয়। মোটরসাইকেল-ওয়ালা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে চিৎকার করতে লাগলো ওর সাথে। মেয়েটা নরম স্বরেই উত্তর দিয়ে গেলো।

কাওরু বলল, "একটা কথা জানিয়ে রাখছি। রুমের ভাড়াটা পাইনি কিন্তু এখনও।"

শীতল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো লোকটা। "আমি হোটেলের বিল নিয়ে মাথা ঘামাবো কেন? যারা মধু খেতে আসে, তারাই দেবে মধুর দাম।" নির্জীব, নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে গেলো সে।

"আমি জানি," কর্কশ হয়ে উঠলো কাওরু'র কণ্ঠস্বর। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল ও, "ভেবেচিন্তে কাজ করো। আমার গায়ে ইঁট মারলে, তোমাকেও পাটকেল খেতে হবে। এই ব্যবসাটা এভাবেই চলে। মেয়েটার গায়ে কাটাছেঁড়ার দাগ আছে, তার মানে মারামারির কেস। ইচ্ছা করলেই পুলিশ ডাকতে পারতাম। তখন কিন্তু তোমাদের অনেক কিছুরই কৈফিয়ত দিতে হতো, তাই না? তাই ভালোয় ভালোয় ছয় হাজার আটশো' ইয়েন চুকিয়ে আমাদের খুশি রাখো। বিয়ারের পয়সাটা নাহয় মাফ করে দিলাম।"

কাওরুর দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোকটা। একবার নিওন সাইনে অ্যালফাভিল লেখাটার দিকে চোখ ঘুরিয়ে হাত থেকে দস্তানা খুললো। তারপর জ্যাকেটের পকেট থেকে সাত হাজার ইয়েন বের করে নামিয়ে রাখলো পায়ের কাছে। বাতাস থেমে আছে, টাকাগুলো তাই সেভাবেই পড়ে রইলো। আবার দস্তানা পরে নিয়ে ঘড়ি দেখলো লোকটা। প্রতিটা কাজই অস্বাভাবিক ধীর গতিতে করছে, কোনো তাড়াহুড়ার ছাপ নেই। যেন সে কতো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ সেটা বোঝাতে চাইছে মেয়েদের। ওদিকে হিংস্র প্রশুর মতো ফোঁসফোঁস করেই যাচ্ছে মোটরসাইকেলের এঞ্জিন।

"তোমার অনেক সাহস," কাওরুকে বলল লোকটা।

"ঠিক ধরেছো।"

"পুলিশকে কিছু জানালে তোমাদের পাড়ায় আগুন লাগতে পারে।"

নীরবতা বজায় রইলো কিছুক্ষণ। হাত ভাঁজ করে লোকটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কাওরু। চাইনিজ মেয়েটা অস্বস্তি নিয়ে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

শেষপর্যন্ত হেলমেট পরে নিলো লোকটা। মেয়েটাকে নিয়ে মোটরসাইকেলে উঠে বসলো। শক্ত করে ওর কাঁধ চেপে ধরলো ডংলি, পেছনে ঘুরে মারি আর কাওরুকে দেখলো ভালো করে। তারপর মারির দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলবে বলবে করেও আর মুখ খুললো না। জোরে প্যাডেল চাপলো লোকটা, একটানে ছুটিয়ে নিলো বাইক। মাঝরাতের রাস্তায় চলন্ত বাইকের আওয়াজ ভেসে এলো আরও কিছুক্ষণ। মারি আর কাওরু কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

রাস্তায় ঝুঁকে সাত হাজার ইয়েন কুড়িয়ে নিলো কাওরু। ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাত বুলিয়ে নিলো কদমছাঁট চুলের ওপর।

"আপদ মিটলো!" নিজের মনেই বলল সে।

অধ্যায় ৪

এরি আসাইয়ের ঘর।

কিছুই বদলায়নি। শুধু চেয়ারে বসা লোকটার ছবি আরেকটু বড় হয়েছে। এখন তাকে অনেকটাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সিগনালে কোথাও সমস্যা হচ্ছে; থেকে থেকে ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করছে ছবিটা। ঝাপসা হয়ে ঝিরঝির শব্দ হচ্ছে হঠাৎ। মাঝে মাঝে অন্য একটা ছবি ভেসে উঠছে পর্দায়। আবার তখনই উধাও হয়ে ফিরে আসছে চেয়ারে বসা ভদ্রলোক।

এখনও ঘুমিয়ে আছে এরি আসাই। টেলিভিশন থেকে ছিটকে আসা কৃত্রিম আভায় জমাট বাঁধা ছায়া পড়ছে ওর শরীরে। কিন্তু তাতে ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটছে না।

টেলিভিশনে যে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে, তার গায়ে একটা বাদামি রঙের বিজনেস স্যুট। এককালে হয়তো সেটা বেশ দামি ছিলো, তবে এখন প্রাচীন লাগছে। ধুলোর মতো সাদা কিছু লেগে আছে পিঠ আর হাতের পেছনদিকে। পায়ের কালো জুতোতেও ধুলো লেগে আছে। এই ঘরে আসার আগে ধুলোভরা কোন জায়গাতে গিয়েছিলো বোধহয়। শার্টের সাথে একটা কালো উলের টাই পরে আছে সে, এ দু'টোর অবস্থাও খারাপ। মাথার চুলগুলো ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। না, বয়সের ছাপ নয়। ধুলোর আস্তরণ জমেছে সেখানেও। অনেকদিন চুল আঁচড়ায় না হয়তো। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে: তাকে দেখে মনে হয় না যে রুচিবোধের অভাব আছে। লোকটা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। হয়তো আচমকা কোনো ঘটনার শিকার হয়েছে সে।

আমরা তার চেহারা দেখতে পাচ্ছি না। স্ক্রিনের দিকে পিঠ দিয়ে আছে। আলো ছায়ার খেলা অথবা অন্য কোনো কারণে তার মুখের ওপর গাঢ় ছায়া পড়েছে। কিছুতেই ধরা পড়ছে না আমাদের চোখে।

পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে আছে লোকটা। একটু পর পর লম্বা করে শ্বাস নিচ্ছে। তারই সাথে তাল মিলিয়ে ওঠা-নামা করছে কাঁধ। অনেকদিন ধরে কি সে এই ঘরে বন্দী? অবশ্য চেয়ারের সাথে হাত-পা বাঁধা নেই।

মেরুদণ্ড সোজা করে টানটান হয়ে বসে আছে লোকটা, নিঃশব্দে শ্বাস নিচ্ছে। একমনে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। ইচ্ছা করে নড়াচড়া বন্ধ রেখেছে, নাকি কোনো কারণে তার নড়াচড়া করার অনুমতি নেই-তা আমাদের পক্ষে বলা অসম্ভব। হাত দুটো হাঁটুর ওপর ভাঁজ করে রাখা।

টেলিভিশনের ভেতরের দৃশ্যটার সময় জানা নেই আমাদের। দিন নাকি রাত, তাও বলা যাচ্ছে না। ফ্লুরোসেন্ট বাতির উজ্জ্বল আলোয় গ্রীষ্মের দুপুরের মতো ঝলমল করছে পুরো ঘর।

স্ক্রিনের ছবির পজিশন বদলালো, ঘুরে গেলো লোকটার চেহারার দিকে। কিন্তু তার পরিচয় বোঝার বদলে আরো অস্পষ্ট হলো ব্যাপারটা। লোকটার মুখ একটা স্বচ্ছ মুখোশে ঢাকা। জিনিসটাকে মুখোশ বলা ঠিক হবে না: একদম মুখের সাথে সেঁটে আছে। মুখের ওপর আঁটসাঁট করে প্লাস্টিক মোড়ালে যেমন হয়। তবে স্বচ্ছ হলেও মুখটাকে আড়াল করে রেখেছে এই মোড়ক। শুধু মুখের অবয়বটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। মুখোশটার নাক, চোখ কিংবা মুখের কাছে কোনো ফুটো নেই। লোকটার তাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় না। হয়তো কোনোভাবে বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা রয়েছে। মুখোশটা কী দিয়ে বা কিভাবে বানানো হয়েছে সে ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই আমাদের। যেন আধুনিক প্রযুক্তি আর প্রাচীন জাদু একসাথে হয়েছে এই অদ্ভুত জিনিসটা তৈরি করার জন্য। লোকটা কি বর্তমানের কেউ? নাকি সুদূর অতীত থেকে ভেসে এসেছে? বা ভবিষ্যৎ?

চামড়ার আরেকটা স্তরের মতো শক্ত হয়ে তার মুখে চেপে বসেছে মুখোশ। তবুও আমরা বুঝতে পারছি না লোকটা কী ভাবছে, বুঝতে পারছি না কেমন অনুভব করছে। তার উদ্দেশ্য কি ভালো? না খারাপ? তার চিন্তাভাবনা কি সোজাসাপটা? নাকি জটিল? মুখোশটা কি তাকে লুকিয়ে রেখেছে? নিরাপত্তা দিচ্ছে? কোনটার উত্তর-ই জানা নেই আমাদের।

টিভির পর্দায় চেয়ারে টানটান হয়ে বসে থাকা লোকটাকে দেখতে পাচ্ছি আমরা। বাতাসে রহস্যের ঘ্রাণ। তবে পরিস্থিতিকে মেনে নেয়া ছাড়া এখন আমাদের আর কিছুই করার নেই। লোকটাকে আপাতত 'চেহারাবিহীন মানব' নাম দেয়া যাক।

ক্যামেরাটা এক জায়গায় এসে থেমে গেছে। চেহারাবিহীন মানবকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছি আমরা। নড়াচড়ার নাম-গন্ধ নেই। একদৃষ্টিতে

তাকিয়ে আছে তো আছেই। টিভির ভেতরটাকে ওপার আর এরি আসাইয়ের ঘরটাকে এপার ধরা যাক। তার মানে ওপার থেকে লোকটা এপারে তাকিয়ে আছে, ঠিক যেখানে আমরা আছি। রহস্যময় চকচকে মুখোশের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে একজোড়া চোখ। তবে আমরা তার অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারছি। আন্দাজ করতে পারছি তার দৃষ্টিসীমাকে। খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখছে সে। এরি আসাইয়ের দিকেই তার নজর। আমরা আরেকটু ভালোভাবে হিসাব করে দেখি। হ্যা, এবার কোন সন্দেহই নেই। লোকটা এরি'র দিকেই তাকিয়ে আছে। ওপার থেকে এপারে তাকিয়ে থাকতে সক্ষম সে। টেলিভিশনের পর্দাটা দুই জগতের মাঝখানে একটা জানালায় পরিণত হয়েছে।

থেকে থেকে স্ক্রিন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে আগের মতো। ঝিরঝির শব্দটাও বেড়ে চলেছে হঠাৎ হঠাৎ। ডাক্তারদের কাছে একধরনের মেশিন আছে, যেটা দিয়ে মানুষের মগজের তরঙ্গ মাপা যায়। সে তরঙ্গগুলো যে ছন্দে ওঠানামা করে, টেলিভিশনের ছবিটাও যেন সেভাবে ঝিরঝির করছে–আবার স্বাভাবিক হচ্ছে। একই ঘটনা ঘটছে বার বার। কিন্তু ভেতরে বসা লোকটা স্থির। মনে হচ্ছে তার মনোযোগ খুব গভীর।

বিছানায় ঘুমিয়ে থাকা সুন্দরির চুলকে ছড়ানো হাতপাখার মতো লাগছে। অদ্ভুত কোমল ঠোঁটদু'টো যেন জ্বলজ্বল করছে রত্নের মতো। টিভির পর্দা থেকে ভেসে আসা আলোর ঝলকানিতে ওর শরীরে ছায়ার নাচন ওঠে। এটাই যেন দেখছে চেহারাবিহীন মানব। এরি আসাইয়ের নিশ্বাসের সাথে তাল মিলিয়ে ওঠা-নামা করছে লোকটার প্রশস্ত কাঁধ। ঠিক যেন ভোরের শান্ত ঢেউয়ে দুলতে থাকা ভেলা।

ঘরের ভেতর আর কিছু নড়ছে না।

অধ্যায় ৫

নির্জন রাস্তায় হাঁটছে মারি আর কাওরু।

মারি নেভি ব্লু ক্যাপ পরে আছে। একটু ছেলেদের মতো লাগছে ওকে দেখতে। হয়তো এই কারণেই সবসময় ক্যাপটা মাথায় চাপিয়ে রাখে ও।

"তুমি না থাকলে ঝামেলায় পড়ে যেতাম," কাওরু বলল। "ছাতার মাথা কিছুই বুঝতাম না।"

হোটলের সামনে যে সিঁড়িটা আছে সেটার কাছে চলে এসেছে ওরা।

"তোমার হাতে সময় থাকলে একটা জায়গায় বসা যায়," কাওরু বলল। "আমার জায়গাটা ভালোই লাগে।"

"কোথায়?"

"ঠাণ্ডা বিয়ারে চুমুক দিতে পারলে জমতো এখন, ঠিক না?"

"আমার মদ খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"জুস বা কোক খেলে না হয়! আরে চলো, চলো! সকাল হওয়ার আগ পর্যন্ত এমনিতেই সময় পার করতে হবে।"

*

ছোট্ট একটা বার কাউন্টারে বসে আছে ওরা, মাঝরাতে আর কোনো কাস্টমার নেই। বেন ওয়েবস্টারের লং-প্লে রেকর্ড বাজছে, পঞ্চাশের দশকের 'মাই আইডিয়াল।' লম্বা, পাতলা গ্লাসে ভরা বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে কাওরু। মারির হাতে লাইম জুস মেশানো পেরিয়ার পানি। বয়স্ক বারটেন্ডার বরফ ভাঙতে ব্যস্ত।

"মেয়েটা বেশ সুন্দরি, তাই না?" মারি জিজ্ঞেস করলো।

"চাইনিজ মেয়েটার কথা বলছো?"

"হুঁ।"

"হ্যা, সুন্দর। কিন্তু এই চেহারা বেশিদিন থাকবে না। এভাবে চলতে

থাকলে রাতারাতিই বুড়িয়ে যাবে একসময়। ওর মতো অনেক দেখেছি।”

“মেয়েটার বয়স মাত্র উনিশ-আমার মতো।”

“আচ্ছা,” কয়েকটা বাদাম মুখে দিলো কাওরু। “বয়সটা এখানে তেমন ইম্পর্ট্যান্ট না। ও যে কাজ করে পেট চালায়, সেটাতে কোনো স্বাধীনতা নেই। নিজেকে লোহার মতো শক্ত রাখতে হয়। একবার ভেঙে পড়েছো তো সব শেষ।”

মারি কিছু বলল না।

“তুমি কলেজে পড়ো?”

“হ্যা। ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজে চাইনিজ পড়ছি।”

“ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজ, না? পাশ করার পর কী করবে?”

“অনুবাদ করতে চাই, দোভাষীর কাজ পেলেও খারাপ হয় না। ন'টা-পাঁচটা রুটিনে অফিস করার ইচ্ছা আমার নেই।”

“স্মার্ট গার্ল।”

“ব্যাপারটা সেরকম না। একদম ছোটবেলা থেকে বাবা-মা'কে বলতে শুনেছি, আমার বেশি বেশি পড়াশোনা করা উচিত। অন্য কিছু করার মতো চেহারা আমার নেই।”

মারির দিকে চোখ সরু করে তাকালো কাওরু। “তুমি অনেক কিউট একটা মেয়ে। তোমাকে খুশি করার জন্য বলছি না, সত্যিই। খারাপ চেহারা কাকে বলে বোঝাতে চাইলে আমার ছবি দেখিয়ে দিয়ো।”

মারি কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো। “আমার বড় বোন দেখতে খুব সুন্দর। যতোটুকু মনে পড়ে, আমাকে সবসময় ওর সাথে তুলনা করা হতো। সবাই জানতে চাইতো দুই বোন এতো আলাদা কেন। কথাটা সত্য: ওর তুলনায় আমি কিছুই না। আমি সাইজে ছোটখাটো, আমার ব্রেস্টও ছোট। জটপাকানো চুল, এত্তোবড় একটা মুখ। চোখে দেখি না ঠিকমতো, চশমা পরে দূরের জিনিস দেখতে হয়।”

কাওরু হাসলো। “ভালো তো। তোমার আলাদা একটা পার্সোনালিটি আছে।”

“ঠিক আছে। তবে ছোটবেলা থেকে সারাদিন কানের কাছে ‘তুমি দেখতে বিশ্রী,’ ‘তুমি দেখতে বিশ্রী,’ শুনলে চিন্তাভাবনা ওলটপালট হয়ে যায়।”

"তাই তুমি পড়াশোনায় মনোযোগ দিলে?"

"হ্যা, সেরকমই বলা যায়। তবে ভালো গ্রেডের আশায় পড়াশোনা করার পক্ষপাতী আমি কখনোই ছিলাম না। আমি খেলাধুলা পারি না, মানুষের সাথে মিশতেও পারি না তেমন একটা। স্কুলে অন্য বাচ্চাকাচ্চারা আমাকে নানাভাবে অত্যাচার করতো। থার্ড গ্রেডের পর আর স্কুলে যাওয়ার সাহস পেতাম না।"

"তার মানে? ফোবিয়া?" কাওরু জানতে চাইলো।

"হুম। আমি স্কুল খুবই অপছন্দ করতাম। সকালবেলা নাস্তা খেয়ে জোর করে বমি করতাম বা পেট ব্যথার ভান করে অজুহাত বানিয়ে ফেলতাম।"

"বাহ। আমার রেজাল্ট কখনোই ভালো ছিলো না। তবে স্কুলে যেতে এতো খারাপ লাগেনি কখনও। কাউকে পছন্দ না হলে অথবা কেউ বিরক্ত করলে পিটিয়ে ভর্তা বানিয়ে ফেলতাম।"

মারি হাসলো। "আমি সেটা করতে পারলে তো হতোই।"

"না, এটা ভালো কিছু না...তারপরে কী হলো তোমার লাইফে?"

"ইয়োকোহামায় চাইনিজ বাচ্চাদের জন্য একটা স্কুল ছিলো। আমার এলাকার এক বন্ধু পড়তো ওখানে। অর্ধেকের বেশি ক্লাস চাইনিজেই নেয়া হতো। ওরা কিন্তু জাপানিজ স্কুলের মতো এতো গ্রেড নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমার বন্ধু আছে দেখে আমিও ওই স্কুলে পড়ার জন্য জেদ ধরলাম। বাবা-মা প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু তাছাড়া আর কোনোভাবেই আমাকে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হচ্ছিলো না।"

"তুমি খুব জেদি ছিলে দেখি।"

"হতে পারে," মারি বলল।

"চাইনিজ স্কুলগুলো জাপানিজ বাচ্চা ভর্তি করতো?"

"হ্যা। ভর্তির ব্যাপারে ওদের তেমন কড়াকড়ি ছিলো না।"

"কিন্তু ওই বয়সে তো তোমার চাইনিজ জানার কথা না।"

"একদমই জানতাম না। তবে আমার বন্ধু অনেক হেল্প করেছে। বয়সও অল্প ছিল, একটানে শিখে ফেলেছি। আমার ভালোই লাগতো, হাই স্কুল পর্যন্ত ওখানেই পড়েছি। বাবা-মা ব্যাপারটা পছন্দ করতেন না যদিও। তারা চাইতেন আমি কোন একটা ভালো প্রাইভেট স্কুলে পড়ে ডাক্তার, উকিল বা সেই জাতীয় কিছু হই। ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভাগ্য ঠিক

করে রাখা হয়েছিলোঃ বড় বোন, মডেল কন্যা, সুপারস্টার; ছোট বোন, মেধাবী।"

"তোমার বোন এতো সুন্দরি?"

মাথা নেড়ে পেরিয়ারে চুমুক দিলো মারি। "পনের-ষোল বছর বয়সেই ও ম্যাগাজিনের জন্য মডেলিং শুরু করেছিলো। টিনেজ মেয়েদের যে ম্যাগাজিন আছে, ওগুলোতে।"

"বাহ্। এমন সুন্দরি বোন থাকাটা আসলেই ঝামেলার। যাক সে কথা। তোমার মতো একটা মেয়ে এতো রাতে বাইরে কী করছে?"

"আমার মতো মেয়ে?"

"মানে...আর কি...সবাই তোমাকে লক্ষী মেয়ে হিসেবেই জানে বোধহয়।"

"আমার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছিলো না।"

"ঝগড়া করেছো?"

মারি মাথা ঝাঁকালো। "না। আমি একটু একা থাকতে চাচ্ছিলাম। সকাল হলেই বাড়ি ফিরে যাব।"

"আগে কখনো এমন করেছো?"

মারি উত্তর দিলো না।

কাওরু বলল, "আমার নাক গলানো উচিত হচ্ছে না। কিন্তু একটা কথা বলি, এই মহল্লাটা তোমার মতো ভালো মেয়েদের রাত কাটানোর জায়গা না। অনেক বিপজ্জনক মানুষ ঘোরাফেরা করে এখানে। আমি নিজেও বহুবার ঝামেলায় পড়েছি। শেষ ট্রেন ছেড়ে যাওয়া আর প্রথম ট্রেন আসার মাঝখানের সময়টায় পুরোপুরি বদলে যায় এই জায়গা। দিনের বেলার সাথে মেলাতে পারবে না একদম।"

বার থেকে ক্যাপটা তুলে নিলো মারি। কিছুক্ষণ সেটা নাড়াচাড়া করে বলল, "সরি। আমরা কি অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করতে পারি?"

একগাদা বাদাম মুখে পুরলো কাওরু। "না, না, ঠিক আছে। অন্য ব্যাপারেই কথা বলি।"

জ্যাকেটের পকেট থেকে ক্যামেল সিগারেটের প্যাকেট বের করলো মারি। তারপর বিক লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে নিলো একটা।

"তুমি সিগারেট খাও!" কাওরু অবাক হলো।

"মাঝে মাঝে।"

"বিশ্বাস করো, ব্যাপারটা একদমই যায় না তোমার সাথে।"

লাজুক হাসি ফুটে উঠলো মারির মুখে।

"একটা নিতে পারি?"

"অবশ্যই।"

কাওরু একটা সিগারেট বের করে আগুন ধরালো। মারিকে ধূমপান করতে দেখার চেয়ে এই দৃশ্যটা অনেক বেশি সহজ স্বাভাবিক।

"বয়ফ্রেন্ড আছে তোমার?"

আলতো করে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালো মারি। "আপাতত আমার ছেলেদের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই।"

"মেয়েদের পছন্দ করো?"

"সেরকমও না। জানি না আসলে।"

আয়েশ করে সিগারেটে টান দিয়ে মিউজিক শুনছে কাওরু। ওর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। যতোটা সম্ভব আরাম করার চেষ্টা করছে এখন।

"একটা কথা জানতে চাই," মারি বলল। "আপনাদের হোটেলটার নাম অ্যালফাভিল কেন?"

"হুঁ, ভালো প্রশ্ন। সম্ভবত এই নামটা আমার বসের দেয়া। লাভ হোটেলগুলোর আজব আজব নাম থাকে। সবগুলোতে কাজ অবশ্য একটাই- ছেলেরা মেয়েমানুষ নিয়ে আসবে, তারপর ফূর্তি করে চলে যাবে। একটা খাট আর বাথটাব হলেই হলো। নাম নিয়ে আর কে মাথা ঘামায়? হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?"

"অ্যালফাভিল আমার খুব প্রিয় একটা সিনেমার নাম, জঁ ল্যুক গদারের বানানো।"

"কখনও তো নামই শুনিনি।"

"অনেক পুরনো। ষাটের দশকের হবে।"

"সেখান থেকেই নিয়েছে হয়তো। পরের বার বসের সাথে দেখা হলে জিজ্ঞেস করব। অ্যালফাভিল মানে কী?"

"ভবিষ্যতের একটা কাল্পনিক শহরের নাম," মারি উত্তর দিলো। "ছায়াপথের কোনো এক জায়গায় সে শহর।"

"ও আচ্ছা, সায়েন্স ফিকশন। স্টার ওয়ার্সের মতো নাকি?"

"না, একদমই না। কোন স্পেশাল এফেক্ট নেই, অ্যাকশন নেই।

সাদা-কালো সিনেমা। কন্সেপচুয়াল সিনেমা আরকি, ডায়ালগে ভরা। আর্ট থিয়েটারে দেখানো হয়..."

"কন্সেপচুয়াল বলতে কী বোঝাচ্ছো?"

"যেমন অ্যালফাভিলে কেউ কান্নাকাটি করলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর সবার সামনে তাকে মেরে ফেলা হয়।"

"কেন?"

"কারণ অ্যালফাভিলে আবেগের কোনো জায়গা নেই। কোনো ভালাবাসা নেই, প্রতিবাদ নেই, নিয়তির সারপ্রাইজ–কিছুই নেই। সেখানে সব অঙ্কের মতো হিসাব মিলিয়ে করতে হয়।"

কাওরু'র কপালে ভাঁজ পড়লো। "নিয়তির সারপ্রাইজ আবার কী?"

"মানে ধরুন আপনি মনে মনে কিছু একটা আশা করে রেখেছেন। কিন্তু বাস্তবে হলো তার উল্টোটা।"

মারির ব্যাখ্যাটা বোঝার চেষ্টা করলো কাওরু। "বুঝলাম না, ঠিক। আচ্ছা, তোমার ওই অ্যালফাভিলে সেক্স আছে?"

"হ্যা, আছে।"

"সেক্সের জন্য সবসময় ভালোবাসা দরকার হয় না। নিয়তির সারপ্রাইজেরও জায়গা নেই।"

"ঠিক।"

হো হো করে হাসলো কাওরু। "তাহলে ঠিকই আছে। লাভ হোটেলের জন্য অ্যালফাভিল নামটা একদম যুৎসই।"

ছোটখাটো এক মাঝবয়সি লোক ঢুকলো বারে, পোশাকে আভিজাত্যের ছাপ। একটা ককটেল অর্ডার করে বারটেন্ডারের সাথে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলো সে। এখানে বোধহয় প্রায়ই আসে লোকটা। তার জন্য আলাদা একটা জায়গা রাখা আছে, ড্রিংকটাও আগে থেকেই ঠিক করে রাখা। রাতের শহরটা এমন অচেনা অতিথিদের দখলেই থাকে।

কাওরুকে জিজ্ঞেস করলো মারি: "আপনি আসলেই রেসলিং করতেন?"

"হ্যা, অনেকদিন। আগে থেকেই বড়সড় ছিলাম, মারামারি পারতাম ভালো। হাই স্কুলে থাকতেই আমার সিলেকশন হয়ে গিয়েছিলো। এই সোনালী চুল, শেভ করা ভ্রু আর লাল বিছের উল্কি নিয়ে যখন রিংয়ে উঠতাম, আমাকে দেখলেই লোকজন ভয় পেতো। টিভিতেও কয়েকবার

আমার খেলা দেখিয়েছে। হংকং, তাইওয়ানসহ আরো কয়েকটা লোকাল ক্লাবে খেলেছি। লেডি রেসলার সম্পর্কে তোমার তেমন ধারণা নেই বোধহয়। কখনো দেখেছো?"

"না।"

"আচ্ছা। এই কাজ বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন। উনত্রিশ বছর বয়সে আমার পিঠে ইনজুরি হয়েছিলো। তারপর খেলা ছেড়ে দিয়েছি। রিংয়ের ভেতর আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। শক্তপোক্ত ছিলাম ঠিকই, তবে সবকিছুর একটা সীমা আছে। আমার বেলায় ব্যাপারটা অন্যরকম ছিলো। কোনো কাজ আধা-আধি করাটা আমার স্বভাবের মধ্যে পড়ে না। আমি চাইতাম, লোকজন আমাকে দেখে মজা পাক। এন্টারটেইনমেন্ট। ওরা আমাকে দেখে চিৎকার করতে শুরু করলে আমি আরও পাগল হয়ে যেতাম। যতোটুকু করা দরকার তার চেয়েও বেশি করতে গিয়ে নিজের ভালোমন্দের দিকে খেয়াল রাখতাম না। তার ফল কী হয়েছে, দেখতেই তো পাচ্ছো! বৃষ্টি-বাদলের দিনে মাজার ব্যথায় নড়তে পারি না এখন। একবার এই ব্যথা শুরু হলে সারাদিন সোজা হয়ে শুয়ে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই।"

ঘাড় ঘুরিয়ে মটমট শব্দ করলো কাওরু।

"যখন আমার নাম ফুটছিলো তখন অনেক টাকা কামিয়েছি। ফ্যানও ছিলো আমার, জানো? কিন্তু ছেড়ে দেয়ার পর আর কিছুই থাকলো না। টাকা কোথায় গেলো? বাবা-মা'র জন্য ইয়ামাগাতায় একটা বাড়ি বানিয়েছি। এই কাজটা ভালো ছিলো, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাকি টাকাগুলো উড়েছে ভাইয়ের জুয়া খেলার দেনা মিটিয়ে আর লোভী আত্মীয়দের পাল্লায় পড়ে। ব্যাংকের দালালদের ফাঁদে পা দিয়ে ভুলভাল ইনভেস্টমেন্ট করেছি, সেখানেও গেছে অনেক টাকা। পয়সা ফুরিয়ে যাবার পরে বসে বসে ভাবতাম, কী করেছি এই দশ বছরে? বয়স ত্রিশ হতে যাচ্ছে, অথচ ব্যাংক ব্যালেন্স জিরো। দিনরাত মন খারাপ করে বসে থাকতাম। এমন সময় ফ্যানদের একজন এখানকার বসের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'লাভ হোটেলের ম্যানেজার হতে চাও?' ম্যানেজার? হাহা! দেখতেই তো পাচ্ছো, আমাকে বরং বডিগার্ড হিসেবেই বেশি মানায়।"

গ্লাসের তলায় পড়ে থাকা বিয়ারটুকু এক চুমুকে শেষ করলো কাওরু। তারপর ঘড়ির দিকে তাকালো।

"কাজে ফিরতে হবে না?" মারি জিজ্ঞেস করলো।

"লাভ হোটেলের একটা ব্যাপার হচ্ছে, এই সময়টায় প্রেশার কম থাকে। ট্রেন ছুটছে না বলে কাস্টমারদের বেশিরভাগই রাতে থেকে যাবে। সকালের আগে তেমন কিছুই হবে না। বলতে পারো আমি ডিউটিতে আছি। তবে একটা বিয়ার খেতেই পারি!"

"তার মানে সারারাত ডিউটি করে সকালে বাড়ি ফেরা?"

"ইচ্ছে করলে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে যেতে পারি। তবে সেখানে গিয়ে কী-ই বা লাভ? কেউ আমার জন্য বসে নেই। বেশিরভাগ রাত আমি হোটেলের ব্যাকরুমেই কাটিয়ে দিই। ঘুম থেকে উঠে আবার কাজ শুরু করি। তুমি কী করবে এখন?"

"চুপচাপ কোথাও বসে বই পড়ে সময় কাটাবো।"

"একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না। ইচ্ছে করলে আমাদের ওখানেও রাত কাটাতে পারো। তোমাকে একটা খালি ঘরে জায়গা দিতে পারবো। আজ রাতে বেশি কাস্টমার আসেনি। লাভ হোটেলের মতো জায়গায় একা রাত কাটানোর ব্যাপারটা একটু মন-খারাপ-করা। তবে আমাদের বিছানাগুলো দারুণ।"

আলতো করে মাথা নাড়লো মারি। একটু চিন্তা করে বলল, "সমস্যা নেই। আমি একটা কিছু বের করে ফেলবো।"

"ঠিক আছে, তোমার যেটা ইচ্ছা।"

"তাকাহাশি কি আশেপাশে কোথাও প্র্যাকটিস করছে? মানে ওর ব্যান্ড আর কি।"

"ও হ্যা, তাকাহাশি। ওরা সারারাতই বেজমেন্টে গানবাজনা করবে। বিল্ডিংটা রাস্তার ওই মাথায়। একবার উঁকি দেবে নাকি? কান ঝালাপালা করে দেবে কিন্তু!"

"না, ঠিক আছে। আমি এমনিই জানতে চাইলাম।"

"আচ্ছা। ছেলেটা একদিন অনেক বড় কিছু হবে। দেখতে বোকাসোকা হলেও ভেতরে এলেম আছে। ফালতু না।"

"ওর সাথে আপনার পরিচয় হলো কীভাবে?"

কাওরু হাসলো। "সে এক মজার কাহিনী। তবে গল্পটা ওর মুখে শোনাই ভালো হবে।"

বিল চুকিয়ে মারি'র মুখের দিকে তাকালো সে। "মারি, সারারাত

বাইরে থাকলে তোমার বাবা-মা রাগ করবে না?"

"তারা জানে আমি বান্ধবীর বাসায় আছি। এমনিতেও আমার কোনো কিছুতে বাবা-মা তেমন একটা মাথা ঘামায় না।"

"তার মানে ওরা তোমার ওপর ভরসা রাখে।"

মারি উত্তর দিলো না।

"কিন্তু সবসময় নিজের বুদ্ধির ওপর ভরসা করলে হয় না," কাওরু বলল।

ভ্রু কুঁচকে তাকালো মারি। "এমন মনে করার কারণ কী?"

"আমার কী মনে হচ্ছে সেটা বড় কথা না," কাওরু বলল। "উনিশ বছর বয়সি মেয়েরা অনেক কিছুই ভাবে। ওই বয়সটা আমি নিজেও পার করে এসেছি।"

কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলো মারি।

আবারও বলল কাওরু, "সামনেই স্কাইলার্ক। চলো, তোমাকে এগিয়ে দিই। ওখানকার মালিক আমার পরিচিত। বলে দেবো, যাতে তোমার খেয়াল রাখে। সকাল পর্যন্ত ওখানেই থাকতে পারবে। ঠিক আছে?"

মারি মাথা নাড়লো। রেকর্ড থেমে গেলো হঠাৎ, স্বয়ংক্রিয় মিউজিক প্লেয়ারটা পিন উঁচিয়ে নিয়েছে। রেকর্ড বদলাতে গ্রামোফোন প্লেয়ারের দিকে আগালো বারটেন্ডার, চাকতিটা বের করে জ্যাকেটের ভেতর ভরে রাখলো। তারপর নতুন একটা রেকর্ড নিয়ে আলোর নিচে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলো। টার্নটেবিলে সেটা রেখে একটা বোতাম টিপলো লোকটা, সাথে সাথে রেকর্ডের গায়ে পিন স্পর্শ করলো। ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ হলো কিছুক্ষণ। তারপর ডিউক এলিংটনের "সোফিসটিকেটেড লেডি" বাজতে শুরু করলো। হ্যারি কার্নি'র বেজ ক্ল্যারিনেটের সুরে বিষন্নতার স্পষ্ট ছাপ। বারটেন্ডারের ঢিমে তেতালা গতি যেন জায়গাটাকে ভিন্ন এক ছন্দে নিয়ে গেলো এক মুহূর্তে।

"এলপি রেকর্ড বাদে অন্য কিছু বাজান না নাকি?" তাকে জিজ্ঞেস করলো মারি। এলপি হচ্ছে পুরনো আমলের গোল গোল রেকর্ড, চোঙার মতো মেশিনে যেগুলো বাজানো হতো।

"আমি সিডি পছন্দ করি না।" বারটেন্ডার জবাব দিলো।

"কেন?"

"বেশি চকচক করে।"

"কিন্তু লং প্লে বদলাতে তো অনেক সময় লাগে!"

হাসলো বারটেন্ডার। "এখন মাঝরাত। সকালের আগে ট্রেন বন্ধ। তাড়াহুড়া করে লাভ কী?"

কাওরু ফিসফিস করে মারিকে সতর্ক করলো। "সাবধান, ওর কিন্তু একটু স্ক্রু ঢিলা.."

"তবে মাঝরাতে সময় চলে নিজের মতো, নিজের তালে," একটা সিগারেট ধরালো বারটেন্ডার। "ইচ্ছা করলেও ধরে রাখার উপায় নেই।"

"আমার আঙ্কেলের প্রচুর এলপি ছিলো," মারি বলল। "বেশিরভাগই জ্যাজ রেকর্ড। সিডির সাথে কখনোই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। তার বাড়িতে গেলে খুব যত্ন করে পছন্দের মিউজিক শোনাতেন। আমার বয়স কম ছিলো তখন, মিউজিক তেমন একটা বুঝতাম না। কিন্তু পুরনো রেকর্ডের খাপের গন্ধটা খুব ভালো লাগতো।"

চুপচাপ মাথা নাড়লো বারটেন্ডার।

"জঁ লুক গদারের মুভির কথা ওই আঙ্কেলের কাছ থেকেই জেনেছি," কাওরুক বলল মারি।

"তোমাদের সম্পর্ক অনেক ভালো ছিলো, না? রুচিরও মিল আছে দেখছি।"

"অনেকটাই। তিনি প্রফেসর ছিলেন, আবার প্লেবয়ও ছিলেন। বছর তিনেক আগে হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।"

মারির দিকে ঘুরলো বারটেন্ডার, "যেকোনো সময় ইচ্ছা হলেই চলে আসবেন। রবিবার বাদে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে খোলা থাকি আমরা।"

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাউন্টার থেকে বই তুলে নিলো মারি। জ্যাকেটের পকেটের ভেতর ঢুকিয়ে টুল থেকে নামলো। রেকর্ড প্লেয়ারে এখনো ডিউক এলিংটনের বিষন্ন সুর বাজছে। মাঝরাতের এই সময়টায় এমন সুর কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দেয়।

*

বড়সড় নিয়ন সাইনটা জ্বলজ্বল করছে: 'স্কাইলার্ক'। কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরের ঝলমলে পরিবেশ। একপাশের টেবিলে

হাসিঠাট্টায় মেতে আছে একঝাঁক ছেলেমেয়ে, দেখে কলেজের ছাত্র-ছাত্রি মনে হয়। ডেনি'জের চেয়ে এই জায়গাটা অনেক বেশি প্রাণবন্ত। রাতের গভীর অন্ধকার স্কাইলার্কের ভেতরে ঢুকতে পারেনি।

বাথরুমে হাত ধুয়ে নিচ্ছে মারি। হ্যাট আর চশমা দুটোই খুলে রেখেছে এখন। সিলিং স্পিকার থেকে নিচু সুরে পেট শপ বয়েজের বিখ্যাত গান 'জেলাসি'-এর সুর ভেসে আসছে। ওর ব্যাগটা সিঙ্কের পাশে রাখা। লিকুইড সোপ দিয়ে যত্ন করে হাত ধুচ্ছে মেয়েটা। মাঝে কয়েকবার আয়নায় নিজের চেহারা দেখেছে। হাত ধোয়া শেষ করে কল বন্ধ করলো মারি, দশটা আঙুল মেলে আলোর নিচে ভালোভাবে দেখলো, তারপর মুছে ফেললো টিস্যু পেপার দিয়ে। আয়নার আরো কাছে ঝুঁকে নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, এই বুঝি কিছু একটা ঘটবে। সিঙ্কের ওপর হাত রেখে চোখ বন্ধ করলো ও, মনে মনে সংখ্যা গুনে চোখ মেলে তাকালো তারপর। আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের চেহারা দেখলো। না, কিছু বদলায়নি।

কপালে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলোকে হাত দিয়ে টেনে সোজা করার চেষ্টা করলো মারি। জ্যাকেটের নিচে পার্কা'র হুডটাকে ঠিকঠাক করলো। তারপর কী যেন ভেবে ঠোঁট কামড়ে মাথা নাড়লো কয়েকবার। আয়নার মারি-ও ঠিক একইভাবে ঠোঁট কামড়ে মাথা নাড়ছে। ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দ্রুত পায়ে রেস্টরুম থেকে বেরিয়ে গেলো মেয়েটা। সশব্দে দরজা বন্ধ হলো।

আমাদের দৃষ্টি রয়ে গেলো বাথরুমের ভেতরে। মারি চলে গেছে, অন্য কোনো মানুষও নেই। ছাদে লাগানো স্পিকার থেকে গানের সুর ভেসে আসছে, হল অ্যান্ড ওটস নামে একটা ব্যান্ডের গান: 'আই ক্যান্ট গো ফর দ্যাট।"

আয়নায় মারির প্রতিবিম্ব আছে এখনো।

আয়নার ভেতরের মারি ওপাশ থেকে এপারের জগতে তাকিয়ে আছে। মলিন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কোনো এক অজানার অপেক্ষায়। এপাশে কেউ নেই। বাথরুমের বাসিন্দা বলতে শুধু এক প্রতিবিম্ব।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এলো সেখানে। গহীন আঁধারে একটানা বেজে চলেছে "আই ক্যান্ট গো ফর দ্যাট।"

অধ্যায় ৬

হোটেল অ্যালফাভিলের অফিসরুম। রাগি রাগি মুখ করে কম্পিউটারে তাকিয়ে আছে কাওরু। সিকিউরিটি ক্যামেরায় যে ভিডিও উঠেছিলো তা দেখছে মনিটরে। সেখানে ফুটে উঠেছে হোটেলের দরজার ছবি। ঝকঝকে, স্পষ্ট। স্ক্রিনের এক কোণায় সময় লেখা আছে। ডায়েরিতে টুকে রাখা সময়ের সাথে স্ক্রিনের সময়টা মিলিয়ে নিলো কাওরু। মাউস ধরে ভিডিওটা ফার্স্ট ফরোয়ার্ড করে এক জায়গায় গিয়ে থামলো। ব্যাপারটায় স্বস্তি পাচ্ছে না সে। একটু পর পর যেভাবে ছাদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

কোমুগি আর কোরোগি ভেতরে ঢুকলো।

"কী অবস্থা, কাওরু?" জিজ্ঞেস করলো কোমুগি।

"মেজাজ খারাপ মনে হচ্ছে!" কোরোগি যোগ করলো।

"সিকিউরিটি-ক্যামেরা ডিভিডি," বিড়বিড় করে বলল কাওরু। "সময় মিলিয়ে ভিডিও দেখলে হয়তো বলা যাবে, মেয়েটাকে কে পিটিয়েছিলো।"

"কিন্তু আমাদের এখানে তো একসাথে কয়েকজন করে কাস্টমার যাওয়া-আসা করে। সবার মধ্যে থেকে ওই লোককে বের করবে কিভাবে?" জানতে চাইলো কোমুগি।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে কীবোর্ডের ওপর নড়াচড়া করতে লাগলো কাওরুর মোটাসোটা আঙুলগুলো। "বাকি সব কাস্টমার জোড়া বেঁধে ঢুকেছে। ওই লোকটা কিন্তু একা এসেছিলো, ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলো চাইনিজ মেয়েটার জন্য। রাত দশটা বায়ান্নতে সে ৪০৪ নম্বর ঘরের চাবি নিয়ে যায়। মেয়েটা ঠিক তার দশ মিনিট পর মোটরসাইকেল থেকে নামে। রিসেপশনে সাসাকি বসে না? ওর কাছ থেকে জেনে নিয়েছি এসব।"

"তার মানে দশটা বায়ান্ন থেকে ভিডিও ফ্রেম দেখতে হবে," কোমুগি বলল।

"হুঁ, তবে কাজটা অতো সহজ না," বলল কাওরু। "এসব যন্ত্রপাতি নিয়ে কী গুঁতোগুঁতি করছি আমি নিজেই জানি না!"

“সব জায়গায় মাসল দিয়ে কাজ হয় না, তাই না?” ফোঁড়ন কাটলো কোমুগি।

“তা ঠিক।”

আন্তরিক ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো কোরোগি। “আমার মনে হয়, কাওরু ভুল সময়ে জন্মেছে।”

“হ্যা,” মাথা নাড়লো কোমুগি। “আরও দু'হাজার বছর আগে জন্মানো উচিত ছিলো ওর।”

“ঠিক বলেছো,” কোরোগি সায় দিলো।

“তোমরা দেখি সবই বোঝো?” কাওরু ওদের দিকে তাকালো। “এই কাজটা করে দিতে পারবে?”

“না!” একসাথে বলে উঠলো দু'জন।

সার্চ কলামে প্রয়োজনীয় সময়টা বারবার টাইপ করছে কাওরু, কিন্তু সঠিক ফ্রেমটা কিছুতেই আনতে পারছে না। কিছু একটা ভুল হচ্ছে। হতাশ হয়ে ম্যানুয়ালে চোখ বুলালো ও। কিছুই না বুঝতে পেরে ছুঁড়ে ফেললো ডেস্কের ওপর।

“কী ভুল করছি বারবার? যেভাবে কাজ করছি, তাতে ওই ফ্রেমটা পেয়ে যাবার কথা। কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছি না। ইশ, এখন যদি তাকাহাশি থাকতো! কয়েক সেকেন্ডে হয়ে যেতো কাজটা।”

“লোকটার চেহারা নাহয় দেখলে,” কোমুগি বলল, “কিন্তু তাতে লাভ কী? এখন তো আর পুলিশে খবর দেয়া যাবে না।”

“আমি খুব সহজে পুলিশের আশেপাশে ভিড়ি না,” কাওরু বলল। “দেমাগ দেখাচ্ছি না কিন্তু।”

“তাহলে কী করবে?”

“সেটা সময় আসলে দেখা যাবে,” কাওরু দীর্ঘশ্বাস ফেললো। “একটা হারামজাদা এসে যাচ্ছেতাই করবে, আর আমি চুপচাপ সহ্য করবো? ও ভেবেছে কী? পুরুষ দেখে অনেক শক্তি বেশি? একটা মেয়েকে পিটিয়ে, সবকিছু নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে? ব্যস? হোটেল ভাড়াটা পর্যন্ত দেয়নি জানোয়ারের বাচ্চা।”

“এই সাইকো হারামজাদাকে খুঁজে বের করা দরকার। পিটিয়ে আধমরা না করলে ওর শিক্ষা হবে না,” কোরোগি বলল।

“আসলেই,” জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো কাওরু। “তবে আবার

এখানে চেহারা দেখানোর মতো বোকা ও নয়। অন্তত দুই-একের ভেতর তো এদিকের ছায়াও মাড়াবে না। আর রাস্তায় রাস্তায় ওকে খুঁজে বেড়ানোর মতো সময় আছে কার?"

"তাহলে কী করতে চাও?" কোমুগি জিজ্ঞেস করলো।

"যা বললাম, সময় হলে ভেবে দেখা যাবে।"

জোরেসোরে মাউসে একটা ঘুসি মারলো কাওরু। উদ্দেশ্যহীনভাবে একটা আইকনে দু'বার ক্লিক করলো তারপর। ওকে অবাক করে, কয়েক সেকেন্ড পর মনিটরে ভেসে উঠোল ১০:৪৮ এর রেকর্ড করা দৃশ্য।

"যাক!"

"বেচারা কম্পিউটার ভয় পেয়ে গেছে," বলল কোরোগি।

চুপচাপ স্ক্রিনের দিকে তাকালো তিনজন, উত্তেজনায় দম আটকে রেখেছে। ঠিক ১০:৫০ এ দু'জন ছেলেমেয়েকে ভেতরে ঢুকতে দেখা গেলো। দেখে কলেজের স্টুডেন্ট বলে মনে হয়। ভয়ে ভয়ে ঘরের ছবিগুলো দেখতে লাগলো ওরা। অবশেষে ৩০২ নম্বর ঘর বেছে বোতাম চাপলো। চাবি হাতে লিফটের দিকে এগোতে দেখা গেলো ওদের।

কাওরু: "এরাই তাহলে তিনশো দুই এর গেস্ট ছিলো আজ?"

কোমুগি: "তিনশো দুই? দেখে খুব ভোলাভালা মনে হচ্ছে। কিন্তু ভেতরে ঢুকে তো উথাল পাথাল করে ফেলেছিলো। ওরা চলে যাবার পর ঘরের অবস্থা দেখলে বুঝতে।"

কোরোগি: "তো কী হয়েছে? বয়স কম তো, তেজ বেশি। এসব জায়গায় আসেই তো উথাল পাথাল করতে!"

কোমুগি: "আমারও তো বয়স কম। আমাক উথাল পাথাল করতে দেখেছো কখনও?"

কোরোগি: "তোমার কোনো একটা ঝামেলা আছে। ওসব তুমি বোঝোই কম।"

কোমুগি: "এহ্! আমার তো মনে হয়..."

কাওরু: "আরে, চারশো চার নম্বর চলে এসেছে। বকবক থামিয়ে দেখো কী হচ্ছে।"

স্ক্রিনে একটা লোককে দেখা গেলো। সময় ১০:৫২।

হালকা ধূসর ট্রেঞ্চ কোট পরে আছে লোকটা। বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মাঝামাঝি হবে। টাই আর জুতোর ধরণ দেখে মনে হয় বড়

কোনো কোম্পানিতে চাকরি করে। চোখে ছোটখাটো চশমার ফ্রেম, হাত দুটো কোটের পকেটে ঢুকানো। উচ্চতা, স্বাস্থ্য, চুল আঁচড়ানোর ভঙ্গি-সবকিছুই সাধারণ গোছের। এমন লোক রাস্তায় পাশ কাটিয়ে গেলে কেউ ঠিকমতো খেয়াল-ও করে না।

"একদম নরমাল লাগছে লোকটাকে," বলল কোমুগি।

"দেখতে নরমাল মানুষগুলোই সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক হয়," চোয়ালে হাত ঘষতে ঘষতে বলল কাওরু।

শান্ত ভঙ্গিতে হাতঘড়ির দিকে তাকালো লোকটা, তারপর ৪০৪ নম্বর ঘরের চাবি তুলে নিলো। ধীর গতিতে লিফটের দিকে এগোতে দেখা গেলো ওকে। মনিটর থেকে উধাও হয়ে গেলো সহসাই।

ছবিটা আটকে রেখে মেয়েদের দিকে তাকালো কাওরু। "কী বুঝলে?"

"কোম্পানিতে চাকরি করা কোনো লোক বলে মনে হলো," উত্তর দিলো কোমুগি।

কাওরু মাথা ঝাঁকালো। ভ্রু কুঁচকে কোমুগির দিকে তাকিয়ে বলল, "বিজনেস স্যুট আর টাই পরা একটা লোক, যে কোম্পানিতে চাকরি করতে পারে, আর এই সময় কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে যায়-এসব তোমার কাছ থেকে শুনে বুঝতে হবে?"

"সরিইইই," কোমুগি বলল।

কোরোগি নিজের মত জানালো: "আমার মনে হয় লোকটা এমন কাজ আগেও করেছে। ও ভালোভাবেই জানে কী করতে হবে। খেয়াল করেছো, কেমন ঠাণ্ডা দেখাচ্ছিলো ওকে?"

"ঠিক," কাওরু হাসলো। "এক ঝটকায় চাবি তুলে নিয়ে সরাসরি লিফটের দিকে হাঁটা দিলো। কোন ইতস্তত ভাব নেই। আশেপাশে একবার তাকালো না পর্যন্ত!"

কোমুগি: "তার মানে এখানে ও প্রথমবার আসেনি?"

কোরোগি: "মানে ও আমাদের নিয়মিত কাস্টমারদের একজন।"

কাওরু: "হতে পারে। হয়তো একই কায়দায় আগেও মেয়েদের এখানে এনেছে।"

কোমুগি: "আছে কিছু মানুষ, চাইনিজ মেয়েদের ব্যাপারে পাগল।"

কাওরু: "মানুষের তো কতোরকমেরই হয়। একটু ভেবে দেখো: চাকরি করে, এখানে আগেও এসেছে। আশেপাশেই কোনো একটা কোম্পানিতে

কাজ করে হয়তো। কী মনে হচ্ছে?"

কোমুগি: "ঠিক বলেছো..."

কোরোগি: "লোকটা বেশি বেশি নাইট ডিউটি করে, তাই না?"

কাওরু ওর দিকে ঘুরে তাকালো। "এমন ভাবার কারণ কী? ধরো, ব্যাটা অফিস থেকে ফেরার পথে বিয়ার খেতে ঢুকেছে। দুই চুমুক বিয়ার গেলার পর একটু ফূর্তি ফূর্তি ভাব হলো। মেয়ে মানুষের খোঁজে অস্থির হয়ে গেলো সাথে সাথে। এমনও তো হতে পারে।"

কোরোগি: "হতে পারে। কিন্তু ভালো করে দেখো, এই লোকটার হাতে কিছু নেই। অফিসে সবকিছু রেখে এসেছে। বাড়ি ফেরার পথে এমুখো হলে হাতে একটা ব্রিফকেস অথবা ব্যাগ থাকতো। কোম্পানির লোকগুলো কখনও খালি হাতে বাড়ি ফেরে না। তার মানে, ওকে এখান থেকে আবার অফিসে ফিরতে হবে। আমার তাই মনে হয়।"

কোমুগি: "বলতে চাচ্ছো লোকটা সারারাত কাজ করে?"

কোরোগি: "অনেকেই তাই করে কিন্তু। সারারাত অফিসে কাজ করে সকালে বাড়ি ফিরে যায়। বিশেষ করে কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ার লোকগুলো। সবাই বাড়ি ফেরার পর ওদেরকে রাজ্যের ঝামেলা নিয়ে বসতে হয়। দিনের বেলা কাজের সময় সিস্টেম শাট ডাউন করা অসম্ভব। তাই রাত দু'টা-তিনটা পর্যন্ত কাজ করে ট্যাক্সিতে চেপে বাড়ি ফিরতে হয় ওদের। ট্যাক্সির ভাড়া পর্যন্ত কোম্পানি দিয়ে দেয়।"

কোমুগি: "তোমার কথায় যুক্তি আছে। ব্যাটাকে দেখে কেমন যেন আঁতেল আঁতেল মনে হচ্ছে এখন। এতো কিছু জানো কীভাবে, কোরোগি?"

কোরোগি: "আসলে, আমি তো হোটেলে কাজ করতাম না। একসময় আমিও একটা কোম্পানিতে চাকরি করতাম। বেশ নামকরা কোম্পানি।

কোমুগি: "সত্যি?"

কোরোগি: "অবশ্যই। কোম্পানির চাকরিতে মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হয়।

কোমুগি: "তবে কেন সেটা-"

কাওরু বাধ সাধলো ওদের আলাপে: "তোমরা বাজে বকা বন্ধ করবে? এই ব্যাপারটার একটা সুরাহা দরকার এখন। ফালতু আলাপ অন্য কোথাও গিয়ে করো।"

কোমুগি: "সরি।"

আবারও ১০:৫২ তে ফিরে গেলো কাওরু, ফ্রেম বেছে নিয়ে একটা নির্দিষ্ট ছবির জায়গায় আটকে ফেললো। ছবিটাকে জুম করে প্রিন্ট করলো তারপর। এখন মোটামুটি চলনসই একটা রঙিন ছবি আছে ওদের হাতে।

কোমুগি: "চমৎকার!"

কোরোগি: "বাহ! কাজ হয়ে গেছে!"

কোমুগি: "ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে, দুনিয়ার হালচাল খুব একটা ভালো না। ইচ্ছা করলেই লাভ হোটেলে ঢুকে ফূর্তি করবে, অথচ কেউ তোমাকে চিনতে পারবে না-কথাটা পুরোপুরি ভুল।"

কাওরু: "সাবধানে থেকো। বাইরে কোথাও উল্টোপাল্টা কিছু করতে যেয়ো না। কখন গোপন ক্যামেরায় সব ভিডিও হয়ে যাবে, টেরও পাবে না।"

কোমুগি: "দেয়ালের কান আছে-সাথে চোখও আছে!"

কোরোগি: "হুম। ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে সবসময়।"

পাঁচটা ছবি প্রিন্ট করলো কাওরু। লোকটার চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো ওরা।

কাওরু: "ছবিটা বড় করার পর একটু ফেটে ফেটে গিয়েছে। তবে চেহারা বুঝতে সমস্যা হয় না, কী বলো?"

কোমুগি: "হ্যা, রাস্তায় কোথাও চোখে পড়লে চিনতে পারবো।"

কাওরু: "আমি বেরোনোর পর তোমরা কেউ অফিসের ফোনটা ব্যবহার করেছিলে?"

মাথা ঝাঁকিয়ে অসম্মতি জানালো দু'জনেই।

কোমুগি: "না।"

কোরোগি: "আমিও না।"

কাওরু: "তার মানে চাইনিজ মেয়েটার পর আর কেউ এই ফোনে কোনো নম্বর ডায়াল করেনি।"

কোমুগি: "ছুঁয়েই দেখিনি।"

কোরোগি: "সত্যি।"

রিসিভার তুলে লম্বা একটা শ্বাস নিলো কাওরু, তারপর রিডায়াল বাটনে চাপ দিলো।

দু'বার রিং বাজতেই ফোন ধরলো কেউ একজন। হড়বড় করে চাইনিজ ভাষায় কিছু একটা বলে গেলো।

কাওরু বলল, "হ্যালো, আমি হোটেল অ্যালফাভিল থেকে বলছি। আজ রাত এগারোটার দিকে একটা লোক আপনাদের একটা মেয়েকে মেরেছিলো। যাই হোক, সিকিউরিটি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে আমরা সেই লোকটার ছবি পেয়েছি। ভাবলাম, জিনিসটা আপনার কাজে লাগতে পারে।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলো লোকটা। তারপর জাপানিজ ভাষায় বলল, "এক মিনিট অপেক্ষা দাঁড়ান।"

"কেয়ামত আসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেও সমস্যা নেই," বিড়বিড় করলো কাওরু।

ওপাশ থেকে ফিসফিস করে পরামর্শ করার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কাওরু কানে রিসিভার ঠেকিয়ে দুই আঙুলের ফাঁকে একটা বলপয়েন্ট কলম ঘোরাতে লাগলো। হাতের ঝাড়ুটাকে মাইকের মতো আঁকড়ে ধরে গুনগুন করতে লাগলো কোমুগি: "দ্য স্নো ইজ ফ-অ-অ-অ-লিং...বাট হোয়্যার আর ইউ-উ-উ-উ?... আই'ল গো অন ওয়ে-য়ে-য়ে-য়েইটিং...টিল আই টার্ন ব্লু-উ-উ-উ..."

আবার ফোনের কাছে ফিরে এলো লোকটা। "ছবিটা এখন আছে?"

"একেবারে গরম গরম প্রিন্ট করেছি," বলল কাওরু।

"এই ফোন নম্বর কীভাবে পেয়েছেন?"

"ডিজিটাল যুগে সব সম্ভব।"

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। অবশেষে লোকটা বলল, "দশ মিনিটের ভেতর আসছি।"

"আমি দরজায় থাকবো।"

লাইন কেটে গেলো। কপাল কুঁচকে ফোন নামিয়ে রাখলো কাওরু। ঘরে এখন পিন পতন নীরবতা।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল কোমুগি, "ইয়ে...কাওরু?"

"কী?"

"আসলেই ওদের ছবিটা দেবে?"

"আগে কী বলেছি শোনোনি? কোন হারামজাদা একটা বাচ্চা মেয়েকে ইচ্ছেমতো পিটিয়ে পালিয়ে যাবে, আর আমি মুখ বুজে বসে থাকবো? হোটেল বিলটা পর্যন্ত দিয়ে যায়নি! এই ফ্যাকাসে চেহারার হারামি ব্যাটাকে দেখলেই আমার মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে।"

কোমুগি: "তা ঠিক আছে। কিন্তু ওরা লোকটাকে খুঁজে পেলে হয়তো পায়ে পাথর বেঁধে টোকিও বে'তে ছুঁড়ে ফেলবে। এসবের সাথে জড়িয়ে গেলে পরে তোমারও ঝামেলা হতে পারে।"

কাওরু এখনও ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। "নাহ, ওরা ওকে মারবে না। চাইনিজরা নিজেদের ভেতর খুন-খারাপি করলে পুলিশ সেগুলো গায়ে লাগায় না। কিন্তু জাপানিজদের কিছু করলে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যায়। ব্যাটাকে ধরে আচ্ছামতো শিক্ষা দেবে ওরা, হয়তো একটা কান কেটে দিতে পারে।"

কোমুগি: "ওহ!"

কোরোগি: "ভ্যান গগে'র মতো।"

কোমুগি: "তবে একটা কথা, কাওরু। তুমি কি মনে করো, শুধু এই ছবিটা দিয়েই ওই লোককে খুঁজে বের করা সম্ভব? শহরটা অনেক বড়..."

কাওরু: "তা ঠিক আছে, কিন্তু তুমি এই চাইনিজগুলোকে চেনো না। ওদের মাথায় একবার কিছু ঢুকলে সেটা করেই ছাড়বে। সম্মান ওদের কাছে অনেক বড়। ওটাকে পুঁজি করেই টিকে আছে ওরা।"

ডেস্কটপের সামনে থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলো কাওরু, মুখে ঢুকিয়ে আগুন জ্বালালো। আস্তে করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো কম্পিউটার স্ক্রিন বরাবর।

স্ক্রিনে এখনও লোকটার ছবি ভেসে আছে।

*

দশ মিনিট পর। কাওরু আর কোমুগি হোটেলের সদর দরজার কাছে অপেক্ষা করছে। কাওরু'র গায়ে আগের সেই চামড়ার জ্যাকেট, উলের হ্যাট নেমে এসে চোখ দুটো ঢেকে দিয়েছে প্রায়। কোমুগি একটা মোটা সোয়েটার পরে আছে।

কিছুক্ষণ পর এক মোটরসাইকেল আরোহী এসে হাজির হলো। এই লোকটাই চাইনিজ মেয়েটাকে নিতে এসেছিলো। আগের মতোই এঞ্জিন চালু রেখে বাইক থেকে নামলো সে। হেলমেট খুলে গ্যাস ট্যাঙ্কের ওপর নামিয়ে রেখে ডান হাত থেকে গ্লাভ খুললো। গ্লাভটা জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে

সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো লোকটা। নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নেই। তিন কপি ছবি নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলো কাওরু।

"লোকটা সম্ভবত আশেপাশেই কোনো কোম্পানিতে চাকরি করে। নাইট ডিউটি হওয়ার চ্যান্স বেশি। একটা ব্যাপারে আমরা শিওর, আগেও সে এখানে মেয়ে মানুষ নিয়ে এসেছে। তোমাদের রেগুলার কাস্টমারদের একজন হতে পারে।"

ছবিগুলো হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো বাইক আরোহী। খুব একটা আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না।

"তো?" কাওরুকে জিজ্ঞেস করলো সে।

"তো মানে?"

"আমাকে এগুলো দিয়ে লাভ কী?"

"আমার মনে হলো, তোমাদের কাজে লাগবে। দরকার নেই?"

উত্তর না দিয়ে জ্যাকেটের চেইন খুললো লোকটা, বুকের সাথে ঝুলিয়ে রাখা থলের মতো একটা জিনিস বের করে ছবিগুলো ভাঁজ করে ঢুকিয়ে রাখলো। তারপর আবার চেইন টেনে তুললো গলা পর্যন্ত। পুরো সময়টাতে একবারের জন্যেও কাওরুর মুখ থেকে চোখ সরায়নি সে।

তথ্য দেয়ার বিনিময়ে কাওরু কী চাইবে, সে ব্যাপারে সন্দিহান লোকটা। আগ বাড়িয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছে না। আগের মতো নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো সে, কথাটা কাওরুর মুখ থেকেই শুনতে চাইছে। ওদিকে হাত ভাঁজ করে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কাওরু। ও নিজেও আগ বাড়িয়ে কথা বলতে রাজি নয়। এমন দম আটকানো পরিস্থিতি বজায় রইলো কিছুক্ষণ। অবশেষে গলা খাঁকারি দিয়ে নিস্তব্ধতার অবসান ঘটালো কাওরু।

"লোকটাকে খুঁজে পেলে আমাকে জানিয়ো, ঠিক আছে?"

বাম হাতে বাইকের হ্যান্ডেল চেপে ধরলো আগন্তুক। ডান হাতে হেলমেট ধরে রেখেছে।

"খুঁজে পেলে তোমাকে জানাতে হবে" বিড়বিড় করে বলল সে।

"ঠিক।"

"শুধু জানালেই হবে?"

মাথা নাড়লো কাওরু। "কথাটা আমার কানে পৌছালেই হবে। কী

করবে, তা জানার দরকার নেই।”

কিছুক্ষণ চিন্তা করলো লোকটা। তারপর হেলমেটে দুটো টোকা মেরে বলল, “ঠিক আছে। খুঁজে পাওয়া গেলে তোমাকে জানাবো।”

“অপেক্ষায় থাকবো,” বলল কাওরু। “আচ্ছা, তোমরা কি এখনও মানুষের কান কেটে নাও?”

লোকটার ঠোঁট সামান্য বেঁকে গেলো। “মানুষের জীবন একটাই। কিন্তু কান দু’টো।”

“সেটা ঠিক। তবে একটা কান হারালে চশমা ঝুলানোর জায়গার অভাব পড়ে যায়।”

“সমস্যা।” এক শব্দে সহমত জানালো লোকটা।

কথোপকথনের এখানেই সমাপ্তি ঘটলো। হেলেমেট পরে জোরে প্যাডেলে চাপ দিলো লোকটা। একটানে বেরিয়ে গেলো রাস্তায়।

চুপচাপ মোটরসাইকেলের দিকে তাকিয়ে রইলো কাওরু আর কোমুগি। অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও চোখ সরালো না।

“লোকটাকে কেমন যেন ভূতের মতো লাগে,” অবশেষে নীরবতা ভাঙলো কোমুগি।

“এই সময় যদি ভূত না বের হয়, তাহলে আর কখন বের হবে?” বলল কাওরু।

“ভয় লাগে কিন্তু।”

“আসলেই।”

চুপচাপ হোটেলের ভেতর ঢুকে গেলো ওরা।

*

একাই অফিসে বসে আছে কাওরু, পা দুটো ডেস্কের ওপর রাখা। ছবিটা হাতে তুলে নিয়ে আবারও ভালোভাবে দেখলো সে। বুকের ভেতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো এক অযাচিত আর্তনাদ। ওর চোখগুলো ঘুরে গেলো ঘরের ছাদের দিকে।

অধ্যায় ৭

কম্পিউটারে কাজ করছে একটা লোক। হোটেল অ্যালফাভিলের সিকিউরিটি ক্যামেরায় এই লোকটাকেই দেখা গিয়েছিলো—ওই যে, ৪০৪ নম্বর ঘরের ধূসর রঙের ট্রেঞ্চ কোট পরা লোকটা। বেশ দ্রুতগতিতে টাইপ করতে পারে সে। তবে এ মুহূর্তে তার মাথায় চিন্তা চলছে টাইপিং-এ ব্যস্ত আঙুলের চেয়েও দ্রুতগতিতে। ঠোঁটজোড়া শক্ত করে চেপে রাখা, চেহারায় কোনো অভিব্যক্তি নেই। শার্টের হাতাদুটো কনুই পর্যন্ত গোটানো। কলারের বোতাম খুলে টাইটা ঢিলে করে রেখেছে। একটু পর পর কিবোর্ডের পাশে রাখা প্যাডে আঁকিবুঁকি কাটছে। হাতে একটা ছাই রঙের পেন্সিল দেখা যাচ্ছে, কোম্পানির নাম: ভেরিটেক। কাছেই একটা ট্রে-তে একইরকম ছয়টা পেন্সিল সাজিয়ে রাখা। প্রত্যেকটা দৈর্ঘ্যে একই এবং নিখুঁতভাবে চোখা করে কাটা।

ঘরটা বেশ বড়। অফিসের সবাই বাড়ি ফিরে গেলেও লোকটাকে কাজের জন্য থেকে যেতে হয়েছে। ডেস্কে রাখা একটা কম্প্যাক্ট সিডি প্লেয়ার থেকে মৃদু আওয়াজে পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে, আইভো পোগোরেলিকের মিউজিক। ঘরটা অন্ধকার, ছাদে ঝোলানো ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প শুধুমাত্র ডেস্কটাকে আলোকিত করে রেখেছে। দৃশ্যটাকে এডওয়ার্ড হার্পারের একটা পেইন্টিং: 'লোনলিনেস'-এর সাথে তুলনা করা যায়। অবশ্য লোকটা যে একাকীত্বে ভুগছে তা নয়; এমন পরিবেশই তার পছন্দ। আশেপাশে কেউ না থাকলে মনোযোগ দিয়ে কাজ করা যায়। প্রিয় গান শুনতে শুনতে সেরে ফেলা যায় অনেককিছু। নিজের চাকরিটাকে পছন্দ করে সে। কাজের দিকে মনোযোগ থাকলে দৈনন্দিন জীবনের ঝুট-ঝামেলা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। সময় বা উদ্যমের ধার না ধেরে যুক্তি আর বিশ্লেষণ শক্তিকে কাজে লাগানো যায়। কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে পুরোদমে কিবোর্ড চাপার সময়ও পিয়ানোর সুরের দিকে মনোযোগ ধরে রেখেছে সে। পোগোরেলিকের ছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে একটানা।

কোনো অপ্রয়োজনীয় ভাবভঙ্গির অস্তিত্ব নেই; শুধু অষ্টদশ শতকের মন মাতানো সুর, কর্মব্যস্ত এক মানুষ, আর একগাদা কাজ।

একটা জিনিসই একটু পর পর মনোযোগে বাধা দিচ্ছে। ডান হাতে ব্যথা। হাত ওঠানামা করে কব্জি ভাঁজ করায় ব্যাঘাত ঘটছে কাজে। বাম হাত দিয়ে ডান হাতের পেছনে মালিশ করার চেষ্টা করলো কয়েকবার। তারপর লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালো। হঠাৎ ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো লোকটা। হাতের ব্যথা ওর কাজের গতিকে মন্থর করে তুলেছে।

পোশাকের দিক থেকে তাকে বেশ পরিপাটি বলা যায়। বেশ ভেবেচিন্তে কাপড় বেছে নিয়েছে লোকটা; খুব বেশি চোখে পড়ে এমন কিছু যেমন নেই, তেমনই নেই অতিরিক্ত আভিজাত্যের ছাপ। তবে রুচির প্রশংসা করতে হয়। শার্ট আর নেকটাইয়ের ভালোই দাম হবে-সম্ভবত বিখ্যাত কোনো ব্র্যান্ডের জিনিস। চোখে-মুখে বুদ্ধিদীপ্ত অভিব্যক্তি। বাম হাতে পরা ঘড়িটা খুব বেশি পুরু নয়, চশমাটা আরমানি গোছের কিছু। লোকটার হাত দুটো তুলনামূলকভাবে লম্বা, বড় বড় আঙুলে যত্ন করে কাটা নখ। বাম হাতের মধ্যাঙ্গুলিতে দেখা যাচ্ছে একটা বিয়ের আংটি। চেহারায় খুব একটা বিশেষত্ব না থাকলেও অভিব্যক্তির মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব আন্দাজ করা যায়। বয়স চল্লিশের বেশি হওয়ার কথা নয়, মুখ আর ঘাড়ের চামড়া এখনও টানটান। এক নজরে কিছুতেই মনে হবে না এমন কেউ চাইনিজ বেশ্যা ভাড়া করে লাভ হোটেলে ঢুকতে পারে। সেই বেশ্যাকে মেরে তার জিনিসপত্র ছিনিয়ে আনতে পারে এই লোক, সে কথা স্বপ্নেও মনে হবে না। তবে এই কাজগুলো করেছে সে, করতে বাধ্য হয়েছে।

ফোন বাজলো, তবে রিসিভার ওঠালো না সে। আগের মতোই নির্বিকার চিত্তে একটানা কাজ করে যেতে লাগলো। এদিকে ফোন বেজেই চলেছে। চারবার রিং হবার পর অ্যানসারিং মেশিনটা চালু হয়ে গেলোঃ

"শিরাকাওয়া বলছি। ফোন ধরতে পারছি না বলে দুঃখিত। বিপ বাজার পর ম্যাসেজ দিয়ে রাখবেন প্লিজ।"

যান্ত্রিক শব্দ শোনা গেলো।

"হ্যালো?" ঘুমজড়িত নারীকণ্ঠ, নিচু স্বরে কথা বলছে কেউ একজন। "আমি বলছি। আছো ওখানে? প্লিজ ফোনটা ধরো।"

কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থেকেই হাতে রিমোট তুলে নিলো

শিরাকাওয়া। ফোনের স্পিকার চালু করার আগে মিউজিক বন্ধ করে দিলো।

"হ্যালো, আছি আমি।"

"কিছুক্ষণ আগে একবার ফোন করেছিলাম, তুমি ছিলে না। আমি ভেবেছি, আজ বোধহয় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে," একটানা কথা বলে গেলো মহিলা।

"কখন ফোন করেছিলে?"

"এগারোটার দিকে। মেসেজ দিয়ে রেখেছি।"

টেলিফোনের দিকে তাকালো শিরাকাওয়া। কথা সত্য: লাল রঙের মেসেজের বাতিটা জ্বলজ্বল করছে।

"সরি, খেয়াল করিনি। কাজে ব্যস্ত ছিলাম," বলল শিরাকাওয়া। "এগারোটার পর, তাই না? খাওয়াদাওয়া করতে বাইরে গিয়েছিলাম। তারপর স্টারবাকসে এক কাপ কফি খেয়েছি। এতোক্ষণ জেগেই ছিলে?"

কিবোর্ড চাপতে চাপতেই কথা বলছে শিরাকাওয়া।

"সাড়ে এগারোটার দিকে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। ভয়ঙ্কর একটা স্বপ্ন দেখে কয়েক মিনিট আগে ঘুম ভেঙেছে। দেখলাম তুমি বাড়ি ফেরোনি। আজকে কী ছিলো?"

শিরাকাওয়া প্রশ্নটা বুঝতে পারলো না। টাইপ করা বন্ধ করে ফোনের দিকে তাকালো ও। কপালের ভাঁজগুলো আরেকটু গভীর হলো।

"কীসের কথা বলছো?"

"মাঝরাতে খেতে গিয়েছো, বললে না? কী খেলে?"

"ও আচ্ছা। চাইনিজ, সবসময় যেটা খাই। অন্যকিছু ভালো লাগে না।"

"কেমন লাগলো?"

"তেমন আহামরি কিছু না।"

আবারও কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে টাইপ করতে লাগলো শিরাকাওয়া।

"কাজ কেমন চলছে?"

"অবস্থা ভালো না। সূর্য ওঠার আগে কেউ একজন সবকিছু ঠিক করতে না পারলে সকালের মিটিংটা ভেস্তে যাবে।"

"সেই কেউ একজনটা নিশ্চয় তুমি?"

"তাছাড়া আর কে? আশেপাশে কাউকে দেখছি না।"

"সময়মতো সামলে নিতে পারবে?"

"অবশ্যই। তুমি পাকা খেলোয়াড়ের সাথে কথা বলছো, ম্যাডাম। শেষ বলে ছক্কা মেরে জেতার অভ্যাস আছে আমার। তাছাড়া, কালকে সকালের মিটিংটা না হলে, আমাদের কোম্পানির মাইক্রোসফট কিনে নেয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

"তোমরা মাইক্রোসফট কিনে নিচ্ছো?"

"আরে, মজা করছি," শিরাকাওয়া বলল। "যাই হোক, আমার আর বড়জোর ঘণ্টাখানেক লাগতে পারে। আশা করছি ট্যাক্সি ডেকে সাড়ে চারটার ভেতর বাড়ি ফিরতে পারব।"

"ততোক্ষণে আমার ঘুমিয়ে পড়ার কথা। সকাল ছয়টায় উঠে বাচ্চাদের খাবার রান্না করতে হবে।"

"তুমি উঠে দেখবে আমি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছি।"

"আর তুমি যখন উঠবে, তখন আমি অফিসে বসে লাঞ্চ করব।"

"আর তুমি বাড়ি ফিরলে, আমি অফিসের কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকব।"

"সেই একই রুটিন। আমাদের ঠিকমতো দেখাই হয় না!"

"আগামী সপ্তাহে আমার চাপ কমে যাবে। বিজনেস ট্রিপ থেকে ফিরে আসছে একজন। নতুন সিস্টেম সামলাতে সাহায্য করবে।"

"সত্যি?"

"হ্যা, তাই তো হওয়ার কথা।" শিরাকাওয়া বলল।

"আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু যতোদূর মনে পড়ে এক মাস আগেও তুমি এমন কিছু একটা বলেছিলে।"

"হুঁ, সেটাই আবার কাট পেস্ট করলাম এইমাত্র।"

ফোনের ওপাশে দীর্ঘশ্বাস ফেললো শিরাকাওয়া'র স্ত্রী। "এবার সেটা সত্যি হলেই হয়। একবার তোমার সাথে আরাম করে খেতে চাই আমি, একই সময়ে ঘুমাতে চাই।"

"হুঁ।"

"আচ্ছা, বেশি চাপ নিও না।"

"চিন্তা করো না। আমি সব গুছিয়ে জলদিই ফিরে আসছি।"

"ঠিক আছে, তাহলে..."

"আচ্ছা।"

"ও, এক মিনিট-"

"কী?"

"পাকা খেলোয়াড়কে এমন কথা বলতে লজ্জা লাগে। তবুও বলছি, বাড়ি ফেরার সময় দোকান থেকে এক কার্টন দুধ আনতে পারবে? তাকানাশি লো-ফ্যাট মিল্ক। যদি পাও আরকি।"

"সমস্যা নেই," বলল সে। "তাকানাশি লো-ফ্যাট।"

ফোন রেখে ঘড়ির দিকে তাকালো শিরাকাওয়া। ডেস্ক থেকে মগ তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিলো একবার। মগটার গায়ে 'ইন্টেল ইনসাইড' লোগো প্রিন্ট করা। আবার সিডি প্লেয়ার চালু করে ডান হাত ভাঁজ করলো ও। বুক ভরে একবার লম্বা করে শ্বাস নিলো, তারপর ফিরে গেলো কাজে। এক কাজ থেকে বিন্দুমাত্র দেরি না করে কীভাবে আরেক কাজে যেতে হয়, সেটা ও ভালো করেই জানে।

*

বড়সড় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। একটা তাকে সারি বেঁধে তাকানাশি লো-ফ্যাট মিল্কের কার্টন সাজানো। তরুণ জ্যাজ মিউজিশিয়ান তাকাহাশি সেই সারির দিকে তাকিয়ে 'ফাইভ স্পট আফটার ডার্ক' এর সুরে শিস বাজাচ্ছে। ওর হাতে একটা শপিং বাস্কেট। হাত বাড়িয়ে একটা দুধের প্যাকেট তুলে নিয়ে দেখলো সেটা লো-ফ্যাট মিল্ক। ভ্রু কুঁচকে আবার জায়গামতো রেখে দিয়ে পাশের সারিতে হাত বাড়ালো। ফুল ক্রিম রেগুলার মিল্কের একটা প্যাকেট বেছে নিয়ে মেয়াদ পরীক্ষা করলো, তারপর নামিয়ে রাখলো শপিং বাস্কেটে।

এরপর ফলের ঝুড়ি থেকে একটা আপেল তুলে নিলো তাকাহাশি। আলোর নিচে কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝতে পারলো জিনিসটার অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। জায়গামতো রেখে দিয়ে আরেকটা আপেল নিলো সে, আগের মতোই সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করলো। শুধু ভালোটা নেবে ও। দুধ আর আপেলের কোনো একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে ওর কাছে।

তাকাহাশি শপিং বাস্কেট হাতে কাউন্টারের দিকে আগোলো। যাবার

পথে প্যাকেটে মোড়ানো ফিশ কেক দেখে তুলে নিলো একটা। ব্যাগের এক কোনায় মেয়াদোত্তীর্ণ হবার তারিখ দেখে নিয়ে তারপর বাস্কেটে রাখলো। কাউন্টারে দাঁড়ানো ক্যাশিয়ারের সাথে লেনদেন শেষ করে খুচরো টাকাগুলো প্যান্টের পকেটে ঢুকালো, তারপর বেরিয়ে পড়লো দোকান থেকে।

কাছেই একটা সিঁড়ির রেলিঙয়ে হেলান দিয়ে ব্যাগ থেকে আপেল বের করলো ছেলেটা। যত্ন করে শার্টের কোণা দিয়ে মুছে নিলো। তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে: রাতের শীতল বাতাসে ধোঁয়ার মতো মিশে যাচ্ছে বুকের ভেতর জমে থাকা নিশ্বাস। এক চুমুক দুধ খেয়ে আপেলে কামড় বসালো সে, সাবধানে চিবোতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে শেষ করলো সেটা। তারপর একটা ভাঁজ পড়া রুমাল দিয়ে মুখ মুছে দুধের কার্টন আর আপেলের অবশিষ্ট অংশটা দোকানের বাইরে রাখা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেললো। ঘড়িতে সময় দেখে হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো তাকাহাশি।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব সেরে একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য বেছে নিলো ও, তারপর হাঁটা দিলো সেদিকে।

অধ্যায় ৮

আবার এরি আসাইয়ের ঘরে ফিরে এসেছি আমরা। দ্রুত চারপাশে চোখ বুলিয়ে বোঝা গেলো সবকিছু আগের মতোই আছে। সময়ের সাথে সাথে আরও গভীর হয়েছে রাত, নিস্তব্ধতাও আরেক কাঠি জেঁকে বসেছে।

না, সবকিছু আগের মতো নেই। একটা জিনিসের পরিবর্তন ঘটেছে। খালি পড়ে আছে বিছানাটা!

এরি আসাই নেই। সে যে ঘুম ভেঙে উঠে গেছে এমন মনে হচ্ছে না। বিছানাটা এখনও পরিপাটি করে গোছানো। বোঝাই যায় না যে কয়েক মুহূর্ত আগে এখানে কেউ শুয়ে ছিল। অদ্ভুত ঘটনা! কীভাবে হলো এটা?

ভালোভাবে ঘরটাকে দেখে নিলাম আমরা।

টিভি চলছে, স্ক্রিনে সেই আগের ঘরটাই দেখা যাচ্ছে এখনো। বিরাট বড় আসবাববিহীন ঘর; সাধারণ ফ্লুরোসেন্ট লাইট, লিনোলিয়ামের প্রলেপ দেয়া মেঝে। ছবিটা স্থির হয়েছে অবশেষে, ঢেউ খেলানো অস্পষ্টতার বদলে ঝকঝকে দৃশ্যপট ফুটে উঠেছে এখন। আগের মতো ঝিরঝির শব্দটাও নেই। মূল নেটওয়ার্ক কোথায় আমাদের জানা নেই, তবে যেখান থেকেই ভেসে আসুক, চ্যানেলটা এখন বেশ স্থির। রাতের জোছনার আলোয় যেভাবে জ্বলজ্বল করে বিস্তৃত মাঠ, ঠিক তেমনভাবে টিভির পর্দা আলোকিত করে রেখেছে এই ঘরটাকে। চুম্বকের মতো যেন সারা ঘরকে আকর্ষণ করছে।

টিভির পর্দায় ফিরে যাই আবার। চেহারাবিহীন মানুষটা আগের মতোই বসে আছে। বাদামি স্যুট, কালো জুতো, সাদা ধূলিকণা, মুখের ওপর লেপ্টে থাকা চকচকে মুখোশ। আগেরবার যেমন দেখেছিলাম, তা থেকে একচুলও পরিবর্তন আসেনি। মেরুদণ্ড টানটান, হাত ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখা, মাথাটা সামান্য নিচের দিকে ঝোঁকানো। গভীর মনোযোগ দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখদুটো মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও আমরা নিশ্চিত, সন্ধানী দৃষ্টি আগের মতোই আটকে আছে নির্দিষ্ট কোথাও। এতো আগ্রহ নিয়ে কী দেখছে সে?

আমাদের চিন্তা পড়তে পেরেই যেন টিভি'র দৃশ্যতে সামান্য পরিবর্তন এলো। এখন একটা বিছানা দেখা যাচ্ছে; একেবারে সাদাসিধে কাঠের তৈরি সিঙ্গেল খাট। এরি আসাই ঘুমিয়ে আছে সেখানে।

ঘরের খালি বিছানার দিকে একবার তাকিয়ে তারপর আমরা টিভির ভেতরের বিছানার দিকে তাকালাম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলাম কিছুক্ষণ। কোনো সন্দেহ নেইঃ দু'টো বিছানাই হুবহু এক।

তবে জায়গা আলাদাঃ একটা এই ঘরে, আরেকটা টিভির ভেতর। টিভির বিছানায় ঘুমিয়ে আছে এরি আসাই।

আচ্ছা, ধরা যাক, ওদিকের বিছানাটাই বাস্তব। এরিকে সাথে নিয়ে ওপারের জগতে চলে গেছে হয়েছে। প্রায় ঘন্টা দু'য়েক আমরা এ ঘরে ছিলাম না, তখনই কিছু একটা ঘটেছে হয়তো। বিকল্প হিসেবে একইরকম দেখতে আরেকটা বিছানা রাখা হয়েছে। ফাঁকা জায়গাটা যাতে বোঝা না যায়, সেজন্যেই হয়তো এই ব্যবস্থা।

ভিন্ন এক জগতে শান্তির ঘুম ঘুমিয়ে আছে এরি আসাই, যেমন ছিলো এই ঘরটায়। সেই একই গভীরতা, একই স্নিগ্ধতা। ঘুমের ঘোরে কে কখন টিভির ভেতরে নিয়ে গেলো, তা ওর জানা নেই। অবশ্য 'ও' না বলে ওর শরীর বলাটাই ভালো হবে বোধহয়। অতল সাগরের মতো গভীর সেই নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটানোর সাধ্য ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের চোখ ধাঁধানো আলোর নেই।

চেহারাবিহীন মানুষটা আগের মতোই নির্বিকার চিত্তে তাকিয়ে আছে এরি'র দিকে, চোখ দুটো মুখোশের আড়ালে ঢাকা। ঘুমন্ত মেয়েটার দিকেই তার সম্পূর্ণ মনোযোগ। এরি এবং চেহারাবিহীন মানুষ, দুজনেই যেন জানে নিজেদের জায়গা কোথায়। পশুরা যেমন নিরাপদ থাকার জন্য নিজেকে গুটিয়ে রাখেঃ নিশ্বাস ধীর হয়ে ফেলে, শরীরের তাপমাত্রা কমিয়ে রাখে-অনেকটা তেমনই। আমরা যেই দৃশ্যটা দেখছি। মনে হচ্ছে স্ক্রিনটা আটকে গেছে। তবে ব্যাপারটা ঠিক তেমন নয়। টিভি'র ঘটনাগুলো এখনই ঘটছে, এই মুহূর্তে। এই ঘর আর টিভির ঘর-দুই জায়গাতেই একই বেগে বয়ে যাচ্ছে সময়। চেয়ারে বসা লোকটার কাঁধের ওঠানামা দেখে সেটা বোঝা যায়। যেই উদ্দেশ্যেই ঘটনাগুলো ঘটুক না কেন, একই সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়েছি আমরা সবাই।

অধ্যায় ৯

স্কাইলার্ক। কাস্টমারের সংখ্যা আগের চেয়ে কম এখন। হইচই করছিলো ছাত্রদের যে দলটা তারা বেরিয়ে গেছে। জানালার পাশে বসে বই পড়ছে মারি, চশমা আর টুপিটা টেবিলের ওপর রাখা। পাশের সিটে ওর ব্যাগ আর জ্যাকেট দেখা যাচ্ছে। টেবিলে একটা প্লেটে কয়েক টুকরো স্যান্ডউইচ আর এক কাপ হার্বাল চা।

তাকাহাশি ভেতরে ঢুকলো। আশেপাশে তাকিয়ে মারিকে খুঁজে বের করলো, তারপর পা বাড়ালো ওর টেবিলের দিকে।

"কী অবস্থা?"

তাকাহাশিকে দেখে আলতো করে মাথা নাড়ল মারি। কোনো কথা বলল না।

"বসলে সমস্যা নেই তো?"

"বসো," নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল মারি।

তাকাহাশি ওর মুখ বরাবর বসলো। কোট খুলে সোয়েটারের হাতা গুটিয়ে নিলো তারপর। ওয়েট্রেস এগিয়ে আসতেই কফির অর্ডার দিলো সে।

"রাত তিনটা," ঘড়ির দিকে তাকালো ছেলেটা। "রাতের সবচেয়ে গভীর অন্ধকার সময়। তোমার ঘুম আসছে না?"

"তেমন না।"

"গতকাল রাতে একদম ঘুম হয়নি আমার। অনেক কঠিন একটা রিপোর্ট লেখতে হয়েছে।"

মারি কিছু বলল না।

"কাওরুর কাছে শুনলাম তুমি এখানে থাকতে পারো।"

মাথা ঝাঁকালো মারি।

"তোমাকে ঝামেলায় ফেলার জন্য সরি। চাইনিজ মেয়েটার কথা বলছি আর কি। প্র্যাকটিসের সময় কাওরু আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলো, চাইনিজ বলতে পারে এমন কাউকে চিনি কিনা। আমার

জানামতে তেমন কেউ নেই। হঠাৎ তোমার কথা মনে হলো। ওকে বললাম, ডেনি'জে এরি আসাই নামে একটা মেয়েকে খুঁজে পেতে পারো। তারপর তুমি দেখতে কেমন সেটাও বুঝিয়ে দিলাম। বেশি ঝামেলা হয়নি তো?"

"না, সমস্যা নেই।"

"কাওরু বলল তুমি অনেক উপকার করেছো। অনেক খুশি। তোমাকে পছন্দ হয়েছে ওর।"

প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চাইলো মারি। "তোমার প্র্যাকটিস শেষ?"

"ব্রেক নিয়েছি," তাকাহাশি বলল। "ভাবলাম এক কাপ কফি খেয়ে শরীর চাঙ্গা করে নেয়া দরকার। তোমাকে ধন্যবাদ জানানোটাও জরুরি ছিলো। কাজে বাধা দিয়েছি-"

কথাটা শেষ করতে দিলো না মারি। "কী বাধা?"

"জানি না। তবে মনে হচ্ছিল, তোমার কাজে বাধা দিয়েছি।"

"গানবাজনা করতে ভালো লাগে তোমার?" মারি জানতে চাইলো।

"হ্যা। আকাশে ওড়ার মতো একটা ফিলিং হয়।"

"তাই? আকাশে উড়েছো নাকি?"

"পাখা থাকলে অবশ্যই উড়তাম," তাকাহাশি হাসলো। "বলার জন্য বললাম আর কি।"

"প্রফেশনাল মিউজিশিয়ান হওয়ার প্ল্যান আছে?"

মাথা ঝাঁকালো ও। "এতো ট্যালেন্ট নেই আমার। বাজাতে পছন্দ করি, তবে সেটা দিয়ে পেট চালাতে পারব না। ভালো বাজানো আর নতুন সুন্দর সুর বানানোর মধ্যে পার্থক্য আছে। ট্রম্বোন জিনিসটা আমি ভালোই বাজাই। মানুষ প্রশংসা করে, আমিও খুশি হই, এর বেশি কিছু না। মাসের শেষে ব্যান্ড ছেড়ে দিচ্ছি, মিউজিকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় ঘনিয়ে এসেছে।"

" 'নতুন সুন্দর সুর বানানো'- বলতে কী বোঝাতে চাইছো? একটা উদাহরণ দিতে পারবে?"

"যেমন ধরো...এমন সুর যেটা তোমার মনের ভেতরে ঢুকে যাবে, তুমি যেভাবে চিন্তা করো সেটা বদলে দেবে। যারা শুনছে তাদের সাথেও ঘটবে একই জিনিস। একই সুতোয় বাঁধা পড়ে যায় দু'জন।"

"অনেক কঠিন শোনাচ্ছে কথাগুলো।"

"আসলেই কঠিন," তাকাহাশি বলল। "সে কারণেই ছেড়ে দিচ্ছি।"

"ট্রম্বোনটা কি আর ছুঁয়েও দেখবে না?"

টেবিলের ওপর উল্টো করে হাত রাখলো তাকাহাশি। "না হয়তো।"

"চাকরিতে ঢুকবে?"

মাথা ঝাঁকিয়ে অসম্মতি জানালো ছেলেটা। "না, সেরকম কিছু করার ইচ্ছা নেই।"

কিছুক্ষণ বিরতির পর মারি জানতে চাইলো, "তাহলে, কী করবে?"

"ব্যারিস্টারি পড়ায় মনোযোগ দেবো। ন্যাশনাল বার এক্সামে বসতে হবে।"

মুখে কিছু না বললেও মারির কৌতূহল বেড়ে গিয়েছে।

"সময় লাগবে," বলতে লাগলো তাকাহাশি। "এতোদিন প্রি-ল'তে ছিলাম। তবে রাতদিন আমার মাথায় শুধু এই ব্যান্ডের চিন্তাই ঘুরপাক খেতো। আইন বিষয়টা পড়ার সময় তেমন গায়েই লাগাইনি। এখন থেকে সিরিয়াস হলেও সবকিছু গুছিয়ে নিতে অনেক কষ্ট হবে। জীবন এতো সস্তা না।"

কফি দিয়ে গেলো ওয়েট্রেস। ক্রিম মিশিয়ে চামচ দিয়ে নাড়লো তাকাহাশি, চুমুক দিলো কফিতে।

"সত্যি বলতে, এই প্রথম আমি কোনোকিছু সিরিয়াসলি পড়ার কথা ভাবছি। আমার রেজাল্ট কখনো খারাপ ছিলো না। তেমন আহামরি ভালো না হলেও, খারাপ করিনি কখনো। যেটুকু দরকার, সেটা পাওয়ার মতো পরিশ্রম সবসময়ই করতাম। সে কারণেই ভালো স্কুলে চান্স পেয়েছিলাম। এখন যেভাবে চলছি, সেভাবে আগালেও হয়তো ভালো কোনো কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে যাব। তারপর ভালো একটা বিয়ে করে সুন্দর বাড়ি বানাবো...বুঝতেই পারছো। কিন্তু হঠাৎ করেই এই ব্যাপারটা খুব বিরক্ত লাগতে শুরু করেছে।"

"কেন?"

"কী কেন? হঠাৎ করে পড়াশোনায় কেন সিরিয়াস হতে চাচ্ছি?"

"হ্যা।"

কফির কাপটাকে শক্ত করে চেপে ধরলো তাকাহাশি, এমনভাবে চোখ সরু করে তাকালো যেন জানালার ফাঁটা কাঁচ দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি মারছে। "আসলেই জানতে চাও?"

"অবশ্যই। না চাইলে কি জিজ্ঞেস করতাম?"

“সেটা ঠিক। তবে মানুষ এমনিতেও ভদ্রতা করে অনেককিছু বলে।”

“তোমার সাথে ভদ্রতা করতে যাবো কেন?”

“তাও ঠিক,” কাপটা নামিয়ে রাখলো তাকাহাশি। “বলছি। বড় করে বলবো নাকি ছোট?”

“মাঝারি।”

“আচ্ছা। মাঝারি সাইজের জবাব।”

একটু চিন্তা করে কথাগুলো মাথার ভেতর গুছিয়ে নিলো তাকাহাশি।

“এ বছর এপ্রিল থেকে জুনের মাঝামাঝি অনেকবার আদালতে গিয়েছি আমি, বেশ কিছু মামলার শুনানি দেখেছি। কাসুমিগাসেকিতে যে জেলা কোর্ট আছে সেখানে। একটা সেমিনারের জন্য দরকার ছিলো: কিভাবে বিচার হয় সেটা দেখে রিপোর্ট লিখতে হয়েছে। তুমি কখনও এসব মামলা দেখেছো?”

মাথা ঝাঁকালো মারি।

“আদালত জায়গাটা অনেকটা সিনেমা হলের মতো। ঢোকার পথে একটা বড়সড় বোর্ডে মামলার তালিকা আর শুরু হওয়ার সময় লেখা থাকে। হলে যেমন লেখা থাকে কোন সময় কোন সিনেমা শুরু হচ্ছে। যেই কেসটা দেখে তোমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হবে, দর্শক হিসেবে সেখানে ঢুকে যেতে পারো। যে কেউ ভেতরে ঢুকতে পারে, শুধু ক্যামেরা কিংবা টেপ রেকর্ডার নেয়া যায় না। ওহ্ আর খাবার নেয়াও নিষেধ। ভেতরে কোনো কথা বলতে পারবে না। সিটগুলো খুব বাজে, বেশি জায়গা থাকে না। কী আর করা, ফ্রিতে ঢুকলে এসব মেনে নিতেই হবে।”

একটু দম নিলো তাকাহাশি।

“আমি মূলত ফৌজদারি মামলার শুনানিতে যেতাম-মারপিট, অগ্নিসংযোগ, খুন, ডাকাতি-এসব। খারাপ লোকজন খারাপ কাজ করে ধরা পড়ে, বিচার হয়, শাস্তি পায়। ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যায়, কী বলো? কিন্তু যেসব মামলা টাকাপয়সা বা ঝগড়া নিয়ে, সেগুলোর সময় আবার ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে হয়। সময়ের সাথে সাথে নানারকম জটিলতা দেখা দেয়, কে যে ঠিক আর কে ভুল সেসব বোঝা যায় না। আমি তখন শুধু রিপোর্ট বানানোর চিন্তায় ছিলাম, মোটামুটি গ্রেড পেলেই হবে, সেই আশায়। স্কুলের বাচ্চারা যেমন শুধু গ্রেডের জন্য হোমওয়ার্ক করে, অনেকটা সে অবস্থা ছিলো।”

এই পর্যায়ে এসে থামলো তাকাহাশি, হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

"কয়েকবার আদালতে গিয়ে কিছু মামলা দেখার পর, আমার চিন্তাভাবনা পাল্টাতে শুরু করলো। কিভাবে মামলার সমাধান হয়, মানুষগুলো কী করে, এসব নিয়ে আগ্রহ জাগলো। তাদের সমস্যাগুলোকে শুধু অন্যের সমস্যা মনে হতো না আমার কাছে। ব্যাপারটা আজব। মানে, ওদের সাথে আমার পরিচিত জগতের কোন মিল নেই। ওদের জগত আলাদা, চিন্তা-ভাবনার ধরন আলাদা। দুই জগতের মাঝখানে মোটা একটা দেয়াল আছে। প্রথম প্রথম অন্তত তেমনই লাগতো। আমি কোনো বাজে কাজ করতে পারবো না, ক্রাইম করতে পারবো না। শান্তি পছন্দ আমার, সোজাসাপটা চিন্তা করতে ভালো লাগে। ছোটবেলা থেকে কারও গায়ে হাত তুলিনি। মামলায় দর্শক ছাড়া আর কিছু হতে চাই না।"

মারি'র মুখের দিকে ভালো করে তাকালো তাকাহাশি। কী যেন ভেবে আবারও বলতে শুরু করলো।

"আদালতে বসে সাক্ষীদের বিবৃতি, বাদীর বক্তব্য, আইনজীবীদের তর্ক-বিতর্ক আর বিবাদীদের কথা শুনতে শুনতে একসময় আমার ধারণা বদলাতে লাগলো। বুঝতে পারলাম যে দেয়ালটা অতো মোটা না। অনেক পাতলা, কাগজের দেয়াল। এটা বোঝার পর আমার মনে হতে লাগলো, যেকোন সময় নিজেকে ওই জগতে দেখবো আমি। কে জানে, হয়তো এখনই ওই জগতে আছি, নিজেও জানি না। ব্যাপারটা বলে বোঝানো কঠিন, খুব অদ্ভুত লাগতো।"

কফির কাপের চারপাশে আঙুল ছোঁয়ালো তাকাহাশি।

"সেসব চিন্তা মাথায় আসার পর থেকে আমার চিন্তাভাবনা পুরো বদলে গেলো। চোখের সামনে এতোদিন যেসব মামলার শুনানি দেখে আসছি, সেগুলোকে মনে হতো আজব কোনো জন্তু!"

"জন্তু মানে?"

"যেমন ধরো, অক্টোপাস। এমন এক অক্টোপাস যে সমুদ্রের গভীরে থাকে। এত্তগুলো লম্বা লম্বা পা নিয়ে সে এগিয়ে যাচ্ছে, অন্ধকার সমুদ্রের ভেতর খোঁজার চেষ্টা করছে পথ। আমি আদালতে বসে আছি, মাথার ভেতর শুধু সেই আজব প্রাণীটাই ঘুরপাক খাচ্ছে। একেক সময় একেক রকম নাম থাকতো প্রাণীটার। কখনো 'আইন', কখনো 'জাতি'। তুমি চাইলে ওর পা

কেটে দিতে পারো, তবে সাথে সাথেই আবার গজিয়ে উঠবে। কেউ ওকে মারতে পারবে না। অসীম শক্তি তার, সমুদ্রের নিচে ঘুরে বেড়ায় নিজের ইচ্ছেমতো। কেউ জানে না ওর হৃদপিণ্ডটা কোথায়। কেমন যেন ভয় লাগতো এসব চিন্তা করতে। ভয়টা বাড়ছিলো দিন দিন। সেই সাথে দানা পাকিয়ে উঠছিলো নিরাশা। সবসময় মনে হতো, এই অবস্থা থেকে আমার কোনো রেহাই নেই, কোথাও পালাতে পারবো না আমি। আমি কী আসলেই আমি, অথবা তুমি কী আসলেই তুমি–এসব নিয়ে ওই জন্তুর কোনো মাথাব্যথা নেই। ওর সামনে প্রত্যেকটা মানুষ নিজের নাম ভুলে যায়, চেহারা হারিয়ে ফেলে। থাকে শুধু চিহ্ন, সংখ্যায় পরিণত হয়ে যাই আমরা।"

মারি একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

"আমি কী বেশি জটিল করে ফেলছি?" কফিতে চুমুক দিলো তাকাহাশি।

"সমস্যা নেই, আমি শুনছি," মারি বলল।

টেবিলে কাপ নামিয়ে রাখলো তাকাহাশি। "দুই বছর আগের কথা। তাচিকাওয়াতে একজায়গায় আগুন লেগেছিলো। এক বুড়ো-বুড়ি দম্পতিকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে, ব্যাংক-বুক চুরি করে তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো এক লোক। অনেক বাতাস বইছিলো সেই রাতে, আশেপাশের আরও চারটা বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিলো। মামলার রায়ে ওকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। জাপানের এখনকার আইন অনুযায়ী, দুই বা তার বেশি মানুষকে খুন করা হলে মৃত্যুদণ্ড হবেই। ফাঁসির রায় হয়। খুনের পাশাপাশি এই লোকটার বিরুদ্ধে আবার অগ্নিসংযোগের অভিযোগও ছিলো। ব্যাটা এমনিতেও বিরাট হারামি, আগে অনেকবার হাজত খেটেছে। নিজের বাবা-মা ওকে বের করে দিয়েছিলো বাড়ি থেকে। নেশাখোরও ছিলো। প্রতিবার জেল থেকে বের হয়ে কোনো না কোনো ঝামেলা করতোই। তবে মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে লোকটা কিছুই বলেনি। অ্যাপিল বাতিল হবে সেটা শিওর ছিলো। ওর পক্ষের উকিল শুরু থেকেই জানতো, কেসটা হেরে যাবে। তাই রায় শুনে কেউ অবাক হয়নি। বিচারক যখন রায় ঘোষণা করছিলেন, আমি চুপচাপ বসে নোট করছিলাম, আর ভাবছিলাম ঠিক কাজই হয়েছে। ওখান থেকে বেরিয়ে কাসুমিগাসেকি থেকে সাবওয়েতে উঠলাম। ডেস্কে বসে মনোযোগ দিয়ে নোট-পত্র ঘাঁটছি, এমন সময় হঠাৎ মাথার ভেতর দেখা দিলো কেমন এক শূন্যতা। মনে হচ্ছিলো সারা পৃথিবীর

ভোল্টেজ কমে গেছে। সবকিছু কেমন যেন অন্ধকার, শীতল। শরীরের ভেতর কাঁপুনি হচ্ছিলো। বুঝতে পারলাম, চোখে পানি চলে এসেছে। এমন হবার কারণ কী? সে ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। অচেনা এক অপরাধী মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে, তাতে আমার কী? মানে...লোকটা আসলেই জঘন্য! ওর ছাড়া পাওয়ার কোনো আশাও ছিলো না। ওর সাথে আমার না আছে কোনো সম্পর্ক, না আছে কোনো মিল। তবুও আমি আবেগে ভেঙে পড়লাম! কেন?"

প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে থমকে গেলো তাকাহাশি। বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। মারি গল্পটা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে।

"আমি যা বলতে চাই তা অনেকটা এরকম," আবারও বলতে লাগলো তাকাহাশি, "প্রতিটা মানুষই ওই বিরাট অক্টোপাসের মতো প্রাণীটার শুঁড়ের ফাঁদে আটকা পড়ে আছে, তা সে ভালো-খারাপ যেমনই হোক। ধীরে ধীরে অন্ধকার জগতে হারিয়ে যাচ্ছে তারা। যে পথেই আগাও না কেন, শেষপর্যন্ত সেই একই পরিণতি মেনে নিতে হবে।"

টেবিলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো তাকাহাশি।

"যাই হোক, সেদিন থেকে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেলো বলতে পারো। মনে মনে ঠিক করলাম, পড়াশোনার ব্যাপারে সিরিয়াস হবো। যা খুঁজে বেড়াচ্ছি, এভাবেই হয়তো সেটা পেয়ে যাবো। আইনের পড়াশোনায় অবশ্যই মিউজিকের মতো আনন্দ নেই। না থাক, জীবন তো এমনই! বড় হওয়ার অর্থটাই এমন!"

দু'জনই চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

"এই তোমার মাঝারি আকারের উত্তর?" মারি বলল।

তাকাহাশি মাথা নাড়লো। "একটু লম্বা হয়ে গেছে বোধহয়। আসলে এই কথাগুলো আগে কাউকে বলিনি। ঠিকমতো গোছাতে না পেরে একটানা বকবক করলাম। ইয়ে... তোমার প্লেটে যে স্যান্ডউইচগুলো আছে, সেখান থেকে একটা নিতে পারি? যদি তুমি না খাও আর কি।"

"এগুলো সবই টুনা স্যান্ডউইচ।"

"আমি টুনা পছন্দ করি। তোমার ভালো লাগে না?"

"লাগে। কিন্তু টুনা মাছ খেলে শরীরের ভেতর পারদ জমে যায়। মার্কারি। সেটা খুব খারাপ।"

"তাই নাকি?"

"হুঁ। শরীরে বেশি পারদ জমলে চল্লিশের আগেই হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা থাকে। চুলও পড়ে যায়।"

ভ্রু কোঁচকালো তাকাহাশি। "তার মানে তুমি মুরগি খেতে পারবে না, আবার টুনাও খাবে না?"

মারি সায় দিলো।

"আর এ দুটোই কিনা আমার প্রিয় খাবার?"

"সরি।"

"আমি অবশ্য পটেটো সালাদও খেতে পছন্দ করি। এখন বলো না, আলুতেও ঝামেলা আছে..."

"না, তা নেই," বলল মারি। "তবে বেশি খেলে মোটা হয়ে যেতে পারো।"

"সমস্যা নেই। আমি এমনিতেই অনেক চিকন।"

একটা টুনা স্যান্ডউইচ নিয়ে আয়েশ করে কামড় বসালো তাকাহাশি।

"তাহলে কী সিদ্ধান্ত নিলে?" মারি জিজ্ঞেস করলো। "বার এক্সাম পাশ করার আগ পর্যন্ত ছাত্রই থেকে যাবে?"

"হ্যা, তাই করবো বোধহয়। কিছুদিন একটু কষ্ট করে চলতে হবে, ছোটখাটো যে চাকরিই পাই নিয়ে নেবো।"

মারি কিছু একটা ভাবছে।

তাকাহাশি ওকে জিজ্ঞেস করলো: "তুমি কখনো *লাভ স্টোরি* দেখেছো? পুরনো একটা সিনেমা।"

মারি মাথা নাড়লো।

"সেদিন টিভিতে দেখাচ্ছিলো। গল্পটা বেশ ভালো। রায়ান ও'নিল নামে এক অ্যাক্টর আছে, সে থাকে বনেদী পরিবারের ছেলে। কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর এক গরীব ইটালিয়ান মেয়ের প্রেমে পড়ে যায়। তাকে বিয়েও করে। বিয়ের পর রায়ানের পরিবার ওকে ত্যাজ্য করে দেয়। এমনকি পড়ালেখার টাকা পাঠানোও বন্ধ করে দেয়। তারপর সে আর তার বৌ কষ্ট করে জীবন চালায়, ছোটখাটো চাকরি করে। এভাবেই পড়ার খরচ ওঠাতে থাকে। শেষমেষ দেখা যায় দু'জনেই হার্ভার্ড থেকে ব্যারিস্টারি পড়ে পাশ করেছে। ওদের চাকরি হয়ে যায় বড় এক অফিসে।"

তাকাহাশি নিঃশ্বাস নেবার জন্য এক মুহূর্ত থামলো। তারপর বলতে লাগলো: "সিনেমাটা দেখলে কী মনে হয়, জানো? গরীবদের লাইফটা

আসলে অতো খারাপ না। একটা আলাদা সৌন্দর্য্য আছে ব্যাপারটায়, একটা আলাদা টান আছে। মোটা সাদা সোয়েটার পরে বরফের ওপর প্রেমিকার সাথে বল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা, ব্যাকগ্রাউন্ডে ফ্রান্সিস লাই-এর বাজানো নরম সুর...না, খারাপ না পুরোপুরি। কিন্তু আমার মনে হয় আমাকে ওই চরিত্রে মানাবে না। আমি গরীব হলে কোনো সৌন্দর্য্য থাকবে না সেটায়। ভালো দেখতে বরফের বল বানানোর যোগ্যতাও আমার নেই। আমার গরীবী দেখতে খুব জঘন্য হবে।"

মারি এখনো কিছু একটা ভাবছে।

তাকাহাশি বলে যাচ্ছে: "তো, রায়ান তো অনেক কষ্ট করে উকিল হচ্ছে, তাই না? কিন্তু উকিল হবার পর যে কী করছে সে ব্যাপারে আমাদের, মানে দর্শকদের, কোনো আইডিয়া নেই। শুধু এটা জানি যে ওর বেতন অনেক মোটা। ম্যানহ্যাটন শহরের চকচকে একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। সে বিল্ডিং-এর একতলায় সবসময় দারোয়ান পাহারা দেয়। বড়লোকদের টেনিস ক্লাবেও রায়ানের যাওয়া-আসা আছে। এর বাইরে আর কিছু দেখায় না।"

তাকাহাশি পানিতে চুমুক দিলো।

"তারপর কী হয়?" মারি জানতে চাইলো।

তাকাহাশি ওপরদিকে তাকালো। গল্পটা মনে করার চেষ্টা করছে। "হ্যাপি এন্ডিং ছিলো, যতোদূর মনে পড়ে। প্রেমিক-প্রেমিকা সারাজীবন সুখে থাকে। ভালোবাসা জয় করে সব বাধা। মানে এমন যে আগে কষ্ট করলেও এখন সব ঠিকঠাক। ঝকঝকে নতুন জাগুয়ার গাড়ি চালায় ওরা, ছুটি পেলেই রায়ান টেনিস খেলে। শীত পড়লে বরফ ছোঁড়াছুঁড়ি করে। এদিকে রায়ানের বাবার ধরা পড়ে ডায়াবেটিস। সাথে লিভার সিরোসিস। লোকটা অসুখে ভুগে একা একা মারা যায়।"

"বুঝলাম না। এই গল্প এতো ভালো লাগার কী আছে?"

তাকাহাশি একদিকে ঘাড় কাত করলো। "কেন ভালো লেগেছে? আমার মনে নেই। ব্যস্ত ছিলাম তখন, শেষটা ভালো করে দেখতে পারিনি...আচ্ছা, হাঁটতে যাবে? একটু হাওয়া বদলানো যাক? রাস্তার সামনে একটা ছোট পার্ক আছে। বেড়ালরা মাঝে মাঝে জড়ো হয় সেখানে। তোমার যে টুনা-মার্কারি স্যান্ডউইচ বেঁচে গেছে সেটা ওদেরকে খাওয়ানো যাবে। আমার কাছে মাছের কেক আছে। তোমার বেড়াল ভালো লাগে?"

মারি মাথা ঝাঁকালো। তারপর বইটা ব্যাগে ভরে উঠে দাঁড়ালো।

তাকাহাশি আর মারি রাস্তা ধরে হাঁটছে। কথা বলছে না। তাকাহাশি শিষ বাজাচ্ছে। কালো রঙের একটা হোন্ডা মোটরসাইকেল ওর পাশ দিয়ে চলে গেলো। চালাচ্ছে সেই চাইনিজ লোকটা–চুলে ঝুঁটি করা। যে অ্যালফাভিল থেকে মেয়েটাকে তুলে নিয়েছিলো। এখন হেলমেট পরনে নেই। সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখছে। তাকাহাশি বা মারি'র সাথে ওর কথা বলার বা দেখা হবার কোনো উপায় নেই। মোটরসাইকেলটা মৃদু গর্জন তুলে চলে গেলো।

মারি তাকাহাশিকে জিজ্ঞেস করলো: "তুমি আর কাওরু একজন আরেকজনকে চেনো কিভাবে?"

"আমি বেশ কিছুদিন ধরেই হোটেলে খুচরা কাজ করছি। ছয় মাসের মতো হয়ে গেছে। ঘর মোছা, ঝাড়ু দেয়া–এসব আরকী। কম্পিউটারের কিছু লাগলেও করে দিই। সফ্‌টওয়্যার ইনস্টল করি, গ্লিচ হলে সারাই। সিকিউরিটি ক্যামেরাও লাগিয়ে দিয়েছি। ওখানে তো সব মেয়ে, মাঝেমধ্যে একজন পুরুষ দেখলে ওদের ভালোই লাগে।"

"কাজ করা শুরু করলে কিভাবে?"

"মানে...?" তাকাহাশি একটু অবাক হলো। "বললামই তো।"

"মানে কিছু হয়েছিলো যেটার পর হোটেলে যাওয়া শুরু করেছো? কাওরু ইচ্ছে করে চেপে যাচ্ছিলো কথাটা, আমি–"

"আচ্ছা, সেটার ব্যাখ্যা দেয়া একটু কঠিন।"

মারি কিছু বলল না।

"আচ্ছা," তাকাহাশি 'বললে আর কী হবে' ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো। "সত্যি কথা হচ্ছে, আমি একবার হোটেলে মেয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। কাস্টমার হিসেবে। শেষ হবার পর, মানে যখন যেতে হবে, তখন বুঝেছিলাম যে পকেটে টাকা নেই। মেয়েটার কাছেও ছিলো না। দু'জনই অনেক মাতাল ছিলাম, খেয়াল ছিলো না। হোটেলের মহিলাদের কাছে আমার আইডি কার্ড জমা দিয়ে এসেছিলাম।"

মারি চুপ।

"ব্যাপারটা একটু...মানে...লজ্জারই।" তাকাহাশি বলল। "তাই পরের দিন গেলাম আবার টাকা দিতে। কাওরু বলল এক কাপ চা খেয়ে যাও। এটা-সেটা নিয়ে গল্প করতে করতে শেষে ও বলল পার্ট-টাইম চাকরির

কথা। বলল পরদিন থেকেই শুরু করতে। পারলে সেদিন থেকেই। মানে শুধু জোর করা বাকি রেখেছিলো আরকি। টাকা-পয়সা বেশি পাই না, কিন্তু ওরা আমাকে মাঝেমধ্যে খাওয়ায়। আর আমি যে জায়গায় ব্যান্ড নিয়ে প্র্যাকটিস করি, কাওরু-ই সে জায়গার খোঁজ লাগিয়ে দিয়েছে। মানে–ওকে দেখলে একটু ভয় লাগে, কিন্তু মানুষ হিসেবে চমৎকার। মাঝে মাঝে ওদের সাথে দেখা করতে যাই। বা ওদের কম্পিউটার নষ্ট হলে আমাকে একটা কল দেয়।"

"মেয়েটার কী হলো?"

"আমি যাকে হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলাম?"

মারি মাথা ঝাঁকালো।

"ওই, তারপরে আর কিছু হয়নি।" তাকাহাশি বলল। "ওই রাতের পর আর একবারও দেখা হয়নি। নিশ্চয়ই আমাকে সহ্য করতে পারে না এখন। দোষটা অবশ্য আমারই। যাই হোক, ব্যাপার না। এমন না যে আমি পাগল ছিলাম ওকে নিয়ে। কয়েকদিন পর হয়তো এমনিতেই ছেড়ে দিতাম।"

"তুমি কি এমন প্রায়ই করো? যেসব মেয়ের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে তাদের হোটেলে নিয়ে যাও?"

"না না, একদমই না। আর সব বাদই দিলাম, এতো টাকা পাবো কোথায়? না, ওই একবারই নিয়েছিলাম।"

দু'জন হাঁটছে এখনো।

অনেকটা অজুহাত দেয়ার ভঙ্গিতে তাকাহাশি বলল: "তাছাড়া, হোটেলে যাওয়ার বুদ্ধিটা আমার ছিলো না। মেয়েটাই বলেছিলো নিয়ে যেতে। আসলেই।"

মারি কিছু বলল না।

"যাই হোক, সেটা আরেক লম্বা গল্প।" তাকাহাশি বলল। "অনেক কিছু হবার পর–"

"তোমার দেখছি লম্বা গল্পের অভাব নেই।"

"তাই তো দেখা যাচ্ছে।" তাকাহাশি বলল। "কেন কে জানে।"

মারি বলল: "তুমি বলেছিলে তোমার ভাই-বোন নেই।"

"হ্যা, আমি একমাত্র।"

"যদি তুমি আর এরি একই হাইস্কুলে পড়ে থাকো, তার মানে তোমার বাবা-মা টোকিওতে থাকেন। ওদের সাথে থাকো না কেন? তাহলে

টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।"

"সেটা আরেক লম্বা–"

"ছোট করে বলা যাবে?"

"হ্যা, যাবে। অনেক ছোট করে বলছি, ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"আমার মা আসলে আমাকে জন্ম দেয়নি।"

"মানে সৎ মা? তার সাথে তোমার সম্পর্ক ভালো না?"

"না, সেটা ভালোই। বাড়িতে গ্যাঞ্জাম লাগিয়ে রাখা আমার পছন্দ না। কিন্তু তাই বলে প্রতিদিন ওদের সামনে নকল হাসি ঝুলিয়ে ভালো ছেলে সেজে থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব না। একা থাকতে খারাপ লাগে না আমার। আর আব্বার সাথে অতো জমে না।"

"তোমাদের ঝগড়া আছে?"

"মানে, আমরা খুব আলাদা টাইপের মানুষ। আমাদের চিন্তাভাবনা আলাদা।"

"উনি কী করেন?"

"সত্যি বলতে আমি সেটা জানি না।" তাকাহাশি বলল। "কিন্তু গর্ব করার মতো কিছু না, এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। তাছাড়া–আর এ কথাটা আমি বেশি মানুষকে বলি না–সে জেলে ছিলো কয়েক বছর। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন। আব্বা বেশ অ্যান্টিসোশাল ছিলো, ক্রিমিনাল। আমি যে ওদের সাথে থাকতে চাই না, তার আরেকটা কারণ হচ্ছে এটা। নিজের ডিএনএ-এর ওপর সন্দেহ চলে আসে।"

"এটা তোমার 'অনেক ছোট' করে বলা?" মারি নকল ভয়ের অভিব্যক্তি টানলো চেহারায়, তারপর হেসে ফেললো।

তাকাহাশি ওর দিকে তাকিয়ে বলল: "আজ সারারাতে তোমাকে এই প্রথম হাসতে দেখলাম।"

অধ্যায় ১০

এরি আসাই এখনো ঘুমাচ্ছে।

কিন্তু চেহারাবিহীন মানুষটা, যে এতোক্ষণ পাশে বসে ওকে দেখছিলো, সে গায়েব হয়ে গেছে। তার চেয়ারটাকেও দেখা যাচ্ছে না। ওদের ছাড়া ঘরটাকে আরো বিষন্ন লাগছে, আরো একাকী। ঘরের ঠিক মাঝখানে বিছানা, বিছানায় এরি শুয়ে আছে। যেন বিস্তীর্ণ সমুদ্রে ভাসমান নৌকায় নিদ্রারত একজন মানুষ।

আমরা দৃশ্যটাকে এদিক থেকে দেখছি–এরি'র আসল বেডরুম থেকে। টিভি স্ক্রিন ভেদ করে। ওই বিষন্ন ঘরে একটা টিভি ক্যামেরাও আছে বোধহয়। এরি'র ঘুমের দৃশ্য রেকর্ড করে সেই ক্যামেরা দৃশ্যটাকে পাচার করে দিচ্ছে টিভি স্ক্রিনে। ক্যামেরার পজিশন আর অ্যাঙ্গল কিছুক্ষণ পর পর বদলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এরি'র দিকে একটু এগিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে পিছিয়ে আসছে।

সময় চলে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। এরি নড়ছে না। শব্দও করছে না। নিখাদ চিন্তার তৈরি এক মহানদীর শান্ত ঢেউয়ে ভাসছে এরি আসাই। আমরা দৃষ্টি সরাতে পারছি না। তাকিয়ে আছি ওর দিকে, তাকিয়েই আছি। কেন এমন হচ্ছে? কারণটা আমরা জানি না। তবে একটা কথা মনে হচ্ছে। যে *কিছু একটা* আছে ওখানে। জীবন্ত কিছু। ওই শান্তির ঢেউয়ের ঠিক নিচে।

পরিবর্তনহীন এই দৃশ্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি আমরা। যেটা দেখা যাচ্ছে না সেটাকে দেখার চেষ্টা করছি।

এরি আসাই-এর ঠোঁটের কোণা নড়ে উঠেছে।

না, নড়া বললে বেশি হয়ে যাবে হয়তো। এতো সুক্ষ সে কম্পন, এতোটাই ক্ষীণ, যে আসলে দেখেছি কিনা সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। হয়তো স্ক্রিনটা নড়েছে, এরি'র ঠোঁট নয়। বা চোখের ভুল। এতোক্ষণ একদিকে তাকিয়ে থাকলে এমন ভুল হতেই পারে। আসলে কী হয়েছে তা

বোঝার জন্য আমরা আরো মনোযোগ দিয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকাচ্ছি।

যেন আমাদের ইচ্ছে টের পেয়ে ক্যামেরার লেন্স আরেকটু জুম ইন করলো, আরেকটু এগিয়ে গেলো এরি'র চেহারার দিকে। খুব কাছ থেকে ওর মুখটা দেখা যাচ্ছে। আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে আছি। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি এর পরে কী হয় দেখার জন্য।

ঠোঁটগুলো নড়েছে আবার।

অতি সামান্য, এক মুহূর্তের জন্য। হ্যা, আগেরবারও এমনই হয়েছিলো। সন্দেহ নেই আর। চোখের ভুল নয়। এরি আসাইয়ের ভেতর কিছু একটা হচ্ছে।

এদিক থেকে এমন চুপচাপ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না আমাদের। স্বাভাবিক। আমরা ওই ঘরের ভেতর কী আছে আরো ভালো করে দেখতে চাই, নিজেদের চোখে। এরি'র মধ্যে যে জীবনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সেটা আরো কাছ থেকে দেখতে চাই। ভাবতে চাই এ লক্ষণের অর্থ কী হতে পারে।

তাই আমরা স্ক্রিনের ওপাশে চলে এসেছি।

একবার মনস্থির করে ফেললে তারপর কাজটা অতো কঠিন না। শরীর ছেড়ে দিয়েছি আমরা, রক্ত-মাংস ছেড়ে দিয়েছি। রেখেছি শুধু একটা ধারণা। একটা দৃষ্টিভঙ্গি। দেয়াল যতো শক্তই হোক, আমরা ভেদ করে চলে যাবো। গর্ত যতো গভীরই হোক, এক লাফে টপকে যাবো সেটা। এই টিভি স্ক্রিনটাকে যেমন পার করলাম।

এক জগৎ থেকে আরেক জগতে যাবার সময় সব কেমন যেন উলটোপালটা হয়ে যায়। ভাঙন ধরে, ফাটল ধরে, মিলিয়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্য যেন সব ধুলো হয়ে যায়–মিহি, নিখাদ ধুলো। সেই ধুলো পাক খায়, ঢেউয়ে পরিণত হয়। সব ধুলো একসাথে এসে নতুন করে সবকিছু গড়ে তোলে।

এখন আমরা অন্যপাশে। স্ক্রিন দিয়ে যে রুমটা একটু আগে দেখছিলাম, সেটার ভেতর। আমরা আশেপাশে চোখ বুলিয়ে দেখছি। একটা গন্ধ আছে এখানে, যেন অনেকদিন রুমটা পরিষ্কার করা হয় না। জানালাটা শক্ত করে লাগানো। বাতাস স্থির।

একটু ঠাণ্ডা লাগছে। স্যাঁতসেঁতেও লাগছে। নীরবতা এতো গভীর যে

সেটা চাপ ফেলছে কানের ওপর। কেউ নেই এখানে। কেউ লুকিয়ে আছে বলেও মনে হচ্ছে না। কখনো থাকলে সে অনেক আগেই চলে গেছে। শুধু আমরা আর এরি আসাই বাদে ঘরটা সম্পূর্ণ খালি।

এরি ঘুমাচ্ছে। ঘরের মাঝখানে যে সিঙ্গল বেডটা আছে সেটায় শুয়ে। বিছানাটা পরিচিত, বিছানার চাদরও।

আমরা ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম। মনোযোগ দিয়ে ওর ঘুমন্ত চেহারা দেখতে লাগলাম। সব খুঁটিনাটি খেয়াল করছি আমরা, তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর জিনিসও চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না। নিখাদ দৃষ্টিভঙ্গি আমরা, শুধু দেখাই আমাদের কাজ। দেখা, তথ্য জোগাড় করা, সম্ভব হলে সে তথ্য বিশ্লেষণ করা। ওকে ছোঁবার ক্ষমতা আমাদের নেই। ওর সাথে কথা বলারও না। আমরা যে এখানে আছি, সেটা ওকে কোনোভাবেই জানানো যাবে না।

কিছুক্ষণ পর আবার এরি'র চেহারা নড়ে উঠলো। গালের মাংস সামান্য কেঁপে উঠেছে, অনেকটা নিজ থেকেই। যেন ওখানে বসা কোনো অদৃশ্য মাছিকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে। তারপর ওর ডান চোখের পাতা নড়লো কিছুটা। চিন্তার ঢেউ তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে। ওর চেতনার গভীরের ছোট্ট কোনো অংশ আরেকটা ছোট অংশকে ডাকছে। কোনো শব্দ ছাড়াই, কোনো ইশারা ছাড়াই ডাকছে। ঢেউয়ের মতো মিলেমিশে যাচ্ছে তারা একে অপরের সাথে।

পুরো ব্যাপারটা ঘটছে আমাদের চোখের সামনে। বুঝতে পারছি যে একটা জটিল চিন্তার টুকরো তৈরি হচ্ছে এরি'র মাথায়। সে টুকরোটা মাথার আরেক এলাকার সাথে সংযোগ তৈরি করলো, আস্তে আস্তে তৈরি হতে লাগলো সচেতনতা। এরি নড়ছে। জেগে ওঠার চেষ্টা করছে।

হয়তো এখনো জাগতে অনেকক্ষণ লাগবে, কিন্তু আর ও ঘুমের গভীরে ফিরে যাবে বলে মনে হচ্ছে না। এক ধাপ এক ধাপ করে জাগরণ আসছে। মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছে, বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু থামছে না। পেছাচ্ছে না।

প্রথমে চেহারার পেশিগুলোতে সুক্ষ কম্পন দেখা দিলো। তারপর কম্পনগুলো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সারা শরীরে। একটা কাঁধ সামান্য উঠলো, তারপর কম্বলের নিচ থেকে বেরিয়ে এলো একটা সাদা হাত। বাঁ হাত। ডান হাত জেগে ওঠার এক মুহূর্ত আগে বাঁ হাতটা জেগেছে। শীতের

আড়মোড়া ভেঙে যেভাবে বসন্তে সজীব হয় গাছের নতুন লতা, সেভাবে হাতের আঙুলে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিলো। নড়তে লাগলো আঙুলগুলো, এমনভাবে যেন কিছু খুঁজছে।

জীবন্ত প্রাণীর মতো আঙুলগুলো বিছানার চাদরে হেঁটে বেড়াতে লাগলো, থামলো এসে এরি'র মসৃণ গলার কাছে। যেন মেয়েটা নিজের রক্তমাংসের অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে।

কিছুক্ষণ পরেই ওর দুই চোখ খুলে গেলো। কিন্তু ছাদ থেকে নেমে আসা ঝকঝকে আলোতে সমস্যা হলো বোধহয়, তাড়াতাড়ি আবার চোখের পাতা বন্ধ করে ফেললো। ওর চেতনা হয়তো জাগার জন্য প্রস্তুত নয় এখনো। কঠিন বাস্তবতার হাতে ধরা দিতে চায় না এরি'র চেতনা, ঘুমের নরম অন্ধকারে ডুবে থাকতে চায়।

কিন্তু ওর শরীর জেগে উঠতে চাচ্ছে। সতেজ আলোর স্পর্শ চায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়গুলোকে করার মতো কিছু দিতে চায়। এরি'র চেতনা আর শরীরের মধ্যে একটা নীরব যুদ্ধ চললো কিছুক্ষণ।

শেষমেষ জয় হলো জাগরণের।

আবার নড়ে উঠলো চোখের পাতা। ধীরে, সতর্ক ভঙ্গিতে চোখদু'টো খুললো আবার। এবারও বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না তারা টিউবলাইটের কর্কশ আলোতে। দুই হাত তুলে এরি নিজের চোখ ঢাকলো। বিছানায় ওপাশ ফিরলো ও, গাল ঠেকালো বালিশে।

কিছুটা সময় বয়ে গেলো। তিন মিনিট। চার। এরি আসাই চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে আগের ভঙ্গিতেই। ঘুমিয়ে গেছে নাকি আবার? না, ওর চেতনাকে সময় দিচ্ছে। জাগ্রত পৃথিবীর সাথে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য। সময় দেয়া উচিত, দেয়াটা জরুরি। যখন একটা শরীরকে এমন ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে বাতাসের চাপ, পরিবেশ অনেক আলাদা, তখন শরীরটাকে মানিয়ে নেয়ার জন্য একটু সময় দিতে হয়। এরি'র চেতনা বুঝতে পারছে যে কোথাও একটা পরিবর্তন এসেছে। সেগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

এরি'র সামান্য গা গুলাচ্ছে। পেটের চামড়া শক্ত হলো এক মুহূর্তের জন্য, মনে হলো যেন সেখান থেকে কিছু বের হওয়ার চেষ্টা করছে। এরি লম্বা কয়েকটা নিশ্বাস টানলো, চেষ্টা করলো স্বাভাবিক হতে।

শেষ পর্যন্ত গা গুলানো ভাবটা চলে গেলো। কিন্তু তার জায়গায় শুরু হলো নতুন অস্বস্তি। হাত-পায়ের কয়েক জায়গা অবশ হয়ে গেছে। কানে চিঁইইই... করে শব্দ হচ্ছে, কয়েকটা পেশিতে খিঁচ ধরেছে। একই ভঙ্গিতে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলো এরি।

আবার কিছু সময় কাটলো।

অবশেষে এরি উঠে বসলো বিছানায়। বিক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত দৃষ্টি ফেললো চারপাশে। বিশাল বড় ঘরটা। আর কেউ নেই। *কোথায় এই জায়গাটা? আমি এখানে এলাম কিভাবে?* ও ভাবলো।

বার বার এরি চেষ্টা করলো নিজের স্মৃতির সুতো ধরে টান দিতে, কিন্তু তৈলাক্ত রাবারের মতো ফসকে গেলো সেই সুতো। ও শুধু বুঝতে পারছে যে এ ঘরে ও ঘুমাচ্ছিলো বেশ কিছুক্ষণ যাবত। বিছানায় বসা এখনো, পরনে পায়জামা, ঘুমানোর পোশাক। *এটা আমার বিছানা, আমার পায়জামা*। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। *কিন্তু এটা আমার বেডরুম নয়*। সেটাও নিশ্চিত।

সারা শরীর অবশ হয়ে আছে, এরি ভাবলো। *তার মানে আমি অনেকক্ষণ ধরে ঘুমাচ্ছি। আর ঘুম গভীর ছিলো। কিন্তু ঠিক কতোক্ষণ সেটা জানি না*। ওর কপালের দু'পাশে দপদপ করতে লাগলো। মগজ এখনো এতো চিন্তা করতে চাচ্ছে না।

জোর করে কম্বলের নিচ থেকে বেরিয়ে এলো ও। সাবধানে মেঝেতে ছোঁয়ালো খালি পায়ের পাতা। সাধারণ নীল রঙের পায়জামা পরে আছে ও, রঙটা চকচক করছে আলোতে।

এখানকার বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। বিছানা থেকে পাতলা কম্বলটা নিয়ে এরি নিজের গায়ে জড়িয়ে নিলো। হাঁটার চেষ্টা করলো, কিন্তু সোজা হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে। যেন পায়ের পেশির মনে নেই কিভাবে এসব করতে হয়। কিন্তু ও হার মানলো না। এক পা এক পা করে নিজেকে এগিয়ে নিতে শুরু করলো। লিনোলিয়ামের নগ্ন মেঝেটা যেন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো ওর দিকে: কে তুমি? এখানে কী করছো?

এসবের উত্তর তো এরি নিজেও জানে না।

একটা জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো ও। বাইরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো কী আছে। কিন্তু কিছুই নেই বাইরে। রঙহীন, বৈশিষ্ট্যহীন এক

জগত। যেন কোনো বিমূর্ত পেইন্টিং।

এরি দুই চোখ ঘষে একটা লম্বা দম নিলো। তারপর আবার তাকালো বাইরে। এখনো আগের মতোই। কিচ্ছু নেই।

এবার ও চেষ্টা করলো জানালা খুলতে। কোনো লাভ হলো না। শক্ত করে আটকানো। ঘরের সবগুলো জানালা এক এক করে খোলার চেষ্টা করলো। সবগুলোই আটকানো।

এরি'র মনে হলো এটা একটা জাহাজ হতে পারে। মৃদু একটা দুলুনি যেন অনুভব করা যাচ্ছে। *আমি হয়তো একটা বড় জাহাজে আছি। পানি যেন না ঢুকতে পারে তাই জানালাগুলো আটকানো*। কোনো এঞ্জিন বা ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায় কিনা ও কান পেতে খেয়াল করলো। না। শুধুই নিস্তব্ধতা।

পুরো ঘরটা একবার ঘুরে দেখলো এরি। দেয়ালগুলো স্পর্শ করলো, লাইটসুইচগুলো বন্ধ করে আবার জ্বালালো। সুইচ বন্ধ করাতে লাইট নিভলো না।

ঘরের দরজা দু'টো। একদম সাধারণ কাঠের দরজা। একটার হাতল ধরে মোচড় দিলো। পুরো হাতল ঘুরে গেলো, দরজা খুললো না। এবার এরি ধাক্কা দিলো দরজায়। খুললো না। টান দিলো। এবারও না।

দ্বিতীয় দরজারও একই অবস্থা। এক সেকেন্ডের জন্য ওর মনে হলো এই দরজা-জানালাগুলো জীবন্ত, ওকে জানাচ্ছে যে বের হতে দেবে না।

দুই হাত মুঠো পাকিয়ে ও দরজার গায়ে কিল দেয়া শুরু করলো। যদি বাইরে কেউ শুনতে পায়। কিন্তু দরজাটা যেন সব শব্দ গিলে ফেলছে। ওর নিজের কানেও বেশি জোরালো মনে হলো না। বাইরের কেউ (যদি বাইরে কেউ থেকে থাকে) এটা কোনোভাবেই শুনতে পাবে না। শুধু শুধু হাত ব্যথা হচ্ছে।

মনে হলো ওর মাথা ঘোরাতে শুরু করেছে। দুলুনির ভাবটাও যেন বেড়েছে আগের চেয়ে।

আমরা খেয়াল করলাম যে গতকাল রাতে শিরাকাওয়া যেখানে কাজ করছিলো, এই ঘরটার সাথে সেটার মিল আছে। একই ঘরও হতে পারে। শুধু এখন এখানে কেউ নেই, কিছু নেই। ছাদের লাইটগুলো ছাড়া। সব আসবাবপত্র বের করে নেয়ার পর দরজা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ভুলে

যাওয়া হয়েছে এই রুমে অস্তিত্ব। ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে সমুদ্রের গভীরে। এই নীরবতা–এই স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, সবকিছু সাক্ষ্য দিচ্ছে সেই ভুলে যাওয়ার।

এরি উবু হয়ে বসলো। ওর দেয়াল ঠেকানো দরজার সাথে। চোখ বন্ধ। এই দুলুনি আর মাথা ঘোরানো ভাবটা কেটে যাওয়ার অপেক্ষা করছে।

কিছুক্ষণ পর ও চোখ খুললো আবার। মেঝেতে কিছু একটা পড়ে আছে। সেটা তুলে নিলো। একটা পেন্সিল। পেন্সিলের পেছনে একটা রাবার বসানো। গায়ে ছাপ দেয়া একটা নাম: ভেরিটেক। শিরাকাওয়া এমন একটা রূপালি পেন্সিলই ব্যবহার করছিলো। শিষটা ভোঁতা।

অনেকক্ষণ এরি তাকিয়ে রইলো পেন্সিলের দিকে। ভেরিটেক নামটা ও জীবনে দেখেনি। এটা কি কোনো কোম্পানির নাম? নাকি এই পেন্সিলের ব্র্যান্ড? বোঝা যাচ্ছে না। আস্তে করে মাথা নাড়লো এরি। এই পেন্সিল বাদে আর কিছু নেই রুমে, যেটা থেকে নতুন কোনো তথ্য জানা যাবে। কিভাবে এই ঘরে এলো ও? আগে কোনোদিন এমন ঘরে যায়নি এরি। স্মৃতির পাতা ওলটাতে ওলটাতে একদম শেষ পর্যন্ত চলে গেলো, কিন্তু কিছু পাওয়া গেলো না।

কে নিয়ে এসেছে আমাকে? কেন? আমি কি মারা গেছি? এটা কি...পরকাল? বিছানার কোণায় এসে বসলো এরি। তারপর শেষের প্রশ্নটা মাথায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। কিন্তু ও যে মারা গেছে সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না। পরকাল তো দেখতে এমন হওয়ার কথা নয়। যদি মৃত্যুর পর এমন একটা খালি রুমে চিরকাল বন্দি হয়ে থাকতে হয়, তাহলে...নরকও তো এতোটা ভয়ংকর হবার কথা নয়। এতোটা আশাহীন। এটা কি তাহলো কোনো স্বপ্ন? না, স্বপ্ন এতোটা...নির্ভরশীল হয় না। সেখানে প্রতি সেকেন্ডে দৃশ্য বদলাতে থাকে। এই ঘরের সবকিছু অনেক নিরেট লাগছে, অনেক বাস্তব। সবকিছু ছুঁয়ে দেখা যাচ্ছে, কোনোকিছু হঠাৎ গায়েব হয়ে যাচ্ছে না।

পেন্সিলটা আবার তুলে নিলো এরি। শিষ দিয়ে খোঁচা মারলো হাতের তালুর উলটোদিকে। হ্যা, ব্যথা লাগছে। রাবারটা নিজের জিভ দিয়ে স্পর্শ করলো। স্বাদটা রাবারের, সন্দেহ নেই।

তার মানে এটা বাস্তব। যা হচ্ছে সব বাস্তবে হচ্ছে। কোনো কারণে আমার স্বাভাবিক বাস্তবকে সরিয়ে তার জায়গা নিয়ে নিয়েছে অন্য কোনো

বাস্তবতা। যেভাবেই এসে থাকি আমি এই ঘরে, বের হবো কিভাবে তা বুঝতে পারছি না। আমি কি পাগল হয়ে গেছি? এটা কি কোনো পাগলাগারদ? না, তাও মনে হয় না। পাগলাগারদে কাউকে নিজের বিছানা আনতে দেয়া হয়? তাছাড়া এই জায়গাটাকে কোনোভাবেই হাসপাতাল মনে হচ্ছে না। জেলখানাও না। শুধু বিশাল, খালি একটা রুম।

বিছানায় ফিরে এলো এরি। আস্তে আস্তে কম্বলে হাত বুলাতে লাগলো। বালিশে চাপড় মারলো কয়েকবার। না, একদম বাস্তব লাগছে। খুব সাধারণ, পরিচিত বিছানা, পরিচিত বালিশ।

এবার এরি আঙুল বুলালো নিজের চেহারার ওপর। পোশাকের ওপর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে নিজের স্তন স্পর্শ করলো। হ্যা, এটা ওর চেহারা, আগের মতোই সুন্দর। এগুলো ওর স্তন, আগের মতোই সুডৌল। *আমি একটা মাংসের টুকরো, একটা পণ্য*, এরি'র মন বলে উঠলো। হঠাৎ একটা সন্দেহ দেখা দিলো ওর মধ্যে। ও কি অতোটা বাস্তব যতোটা ভাবছিলো?

মাথা ঘোরানোটা কেটে গেছে, কিন্তু দুলুনিটা আছে এখনো। ওর পায়ের নিচ থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে বার বার। শরীরে ভেতরে যেন কিছু নেই, একটা খালি গুহাতে পরিণত হয়েছে। 'এরি' বলে যা কিছুর অস্তিত্ব ছিলো, সব যেন সরিয়ে নেয়া হচ্ছে এক এক করে। সরাচ্ছে বিশাল, অদৃশ্য কোনো হাত। ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পেশি, ঈন্দ্রিয়, স্মৃতি। বাইরের কোনোকিছুর জন্য ওকে একটা পাত্রে পরিণত করা হচ্ছে, শূন্য করা হচ্ছে।

এরি'র গায়ে কাঁটা দিলো। এতো নিঃসঙ্গ কোনোদিন লাগেনি। *ভালো লাগছে না আমার*। ও মনে মনে চিৎকার করলো। *আমি এভাবে বদলাতে চাই না!*

কিন্তু চিৎকারগুলো মুখ দিয়ে বের হলো না। মৃদু, খুব মৃদু একটা গোঙানি ছাড়া আর কিছু বের হলো না ওর মুখ থেকে।

আমাকে আবার ঘুমাতে দাও! এরি মনে মনে কেঁদে উঠলো। *আবার ঘুমাতে চাই আমি, জেগে উঠতে চাই আমার আগের বেডরুমে*। এই রুম থেকে পালানোর আর কোনো বুদ্ধি মাথায় আসছে না। হয়তো চেষ্টা করলে কাজ হতে পারে। কিন্তু সহজে ঘুম আসবে না। আর সব বাদ দিলেও, মাত্র ঘুম থেকে উঠেছে ও। তার আগে লম্বা সময় ধরে গভীর নিদ্রায় ছিলো। এতো গভীর যে বাস্তবতা বদলে যাবার সময়ও বোঝেনি।

পেন্সিলটাকে দুই আঙুলে ধরে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘোরাতে শুরু করলো এরি। যদি এটার দিকে তাকিয়ে থাকলে কোনো স্মৃতি মাথাচাড়া দেয়, সেই আশায়। কিন্তু আঙুলগুলো স্মৃতিকে জাগাতে পারলো না। শুধু তীব্র হলো মুক্তির আকাঙ্খা, নিঃসঙ্গতার চাপ।

প্রায় অবচেতনভাবে পেন্সিলটাকে ও ছেড়ে দিলো। টুকটুক শব্দ তুলে জিনিসটা পড়লো মেঝেতে। বিছানায় শুয়ে কম্বলটা নিজের গায়ে জড়িয়ে নিলো এরি। তারপর চোখ বন্ধ করলো।

ও ভাবলো: *কেউ জানে না আমি এখানে এসেছি। আমি নিশ্চিত। কেউ জানে না আমি এই ঘরে বন্দী*।

আমরা জানি। কিন্তু এই ব্যাপারে নাক গলানোর ক্ষমতা নেই আমাদের। আমরা ওপর থেকে তাকিয়ে আছি, দেখছি ও শুয়ে আছে বিছানায়। আস্তে আস্তে আমরা সরে যেতে শুরু করলাম। ছাদ ভেদ করে ভেসে উঠলাম আমরা, এরি যেন ছোট হয়ে গেলো, আরো ছোট। আমাদের গতি বাড়তেই লাগলো। একসময় বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে গেলাম, পৃথিবীও ছোট হয়ে যেতে লাগলো এরি'র মতো। মহাশূন্যে ভেসে যাচ্ছি আমরা। পৃথিবী পরিণত হলো ছোট্ট মুক্তোয়, তারপর একদম মিলিয়ে গেলো। থামার ক্ষমতা নেই আমাদের।

পরমুহূর্তে ফিরে এলাম আমরা এরি'র ঘরে। বিছানা খালি। টিভি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। ঝিরঝির করছে, এছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সেটার কর্কশ শব্দে ভরে উঠেছে বাতাস। কিছুক্ষণ আমরা টিভির দিকে তাকিয়ে রইলাম, উদ্দেশ্যহীনভাবে।

আরো গাঢ় হচ্ছে ঘরের অন্ধকার। একসময় পুরো নিকষ কালো হয়ে গেলো। ঝিরঝিরও মুছে গেছে টিভি থেকে। অন্তহীন আঁধার।

অধ্যায় ১১

মারি আর তাকাহাশি পার্কের একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসে আছে। পার্কটা বেশি বড় নয়, শহরের মাঝখানে ছোট্ট একটুকরো জায়গা নিয়ে। পুরনো একটা কলোনির পাশে এই পার্ক। ভেতরে বাচ্চাদের খেলার জন্য একটা জায়গা আছে, দোলনা দেখা যাচ্ছে সেখানে। ছোট একটা ঝর্ণাও আছে। ল্যাম্পপোস্টের সাদাটে আলোয় আলোকিত সবকিছু। গাছের দল তাদের শুকনো ডাল বাড়িয়ে দিয়েছে আকাশের দিকে। নিচে ঝোপও আছে বেশ কয়েকটা। প্রতিটা গাছের নিচে মরা পাতার ঘন গালিচা তৈরি হয়েছে। মাটি দেখা যাচ্ছে না সেখানে। পাতাগুলোর ওপর পা ফেললে একটা সুরেলা মড়মড় ধ্বনি শোনা যায়।

এতো রাতে পার্কে মারি আর তাকাহাশি বাদে আর কেউ নেই। শেষ-শরতের সাদা চাঁদ ঝুলে আছে আকাশ থেকে, দেখতে অনেকটা তরবারির বাঁকানো ফলার মতো লাগছে। মারি'র কোলে বসে আছে একটা সাদা বেড়াল। ওর হাতে ধরা স্যান্ডউইচে ছোট ছোট কামড় বসাচ্ছে। মারি আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বেড়ালের পিঠে। একটু দূর থেকে আরো কয়েকটা বেড়াল ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"অ্যালফাভিলে কাজ করার সময় আমি মাঝেমধ্যে এখানে এসে বসে থাকতাম।" তাকাহাশি বলল। "খাওয়াতাম বেড়ালগুলোকে। এখন আর বেড়াল পালা সম্ভব না আমার পক্ষে, পিচ্চি একটা বাসায় থাকি। কিন্তু ওদেরকে আদর করতে এখনো ভালো লাগে।"

"বাবা-মায়ের সাথে যখন থাকতে তখন বেড়াল ছিলো তোমার?" মারি জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, কোনো ভাই-বোন ছিলো না তো, তাদের অভাব মেটানোর চেষ্টা করেছিলাম।"

"তুমি কুকুর পছন্দ করো না?"

"করি। আমার অনেকগুলো কুকুরও ছিলো। কিন্তু কুকুরের চেয়ে বেড়াল ভালো। মানে আমার তাই মনে হয় আরকি।"

"আমি কোনোদিন বেড়াল পালিনি।" মারি বলল। "কুকুরও না। আমার বোনের অ্যালার্জি আছে এসবে। হাঁচি দিতে থাকে।"

"আচ্ছা।"

"ছোটবেলা থেকেই ওর অনেকরকম অ্যালার্জি–বসন্তের ফুল, চিংড়ি মাছ, নতুন রঙ, সবকিছুতেই সমস্যা ছিলো।"

"নতুন রঙ?"

"মানে বাসায় নতুন-নতুন রঙ লাগানো হলে ওর সেটাতে অ্যালার্জি হতো।"

"তাই নাকি? এমন কথা তো জীবনে শুনিনি।" তাকাহাশির ভ্রু কুঁচকে গেলো।

"হ্যা, আসলেই। অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যেতো ওর। দম আটকে যেতো, গলা ফুলে ঢোল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া লাগতো ওকে।"

"নতুন রঙ শুঁকলেই প্রতিবার হাসপাতালে যেতে হতো?"

"না, প্রতিবার না, তবে প্রায়ই।"

"কতো কষ্ট।"

মারি কিছু না বলে বেড়ালটাকে আদর করতে লাগলো।

"আর তোমার?"

"মানে আমার অ্যালার্জি আছে কিনা?"

"হ্যা?"

"না, আমার জানামতে নেই। আমি অসুস্থ হই না। এরি হচ্ছে নরমসরম সুন্দরি, রূপকথার রাজকুমারী–আমি না। আমাকে বরং মাঠে ভেড়া চড়ায় যেসব মেয়ে তাদের সাথে তুলনা করলে মানায়।"

"এতো বেশি রাজকুমারীর দরকারও নেই বোধহয়।"

মারি মাথা ঝাঁকালো।

"আর ভেড়া চড়ানো খারাপ কিছু না। আমার তো ব্যাপারটা ভালোই লাগে। তাছাড়া রঙের গন্ধ পেলে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাও না, সেটাও ভালো জিনিস।"

মারি তাকালো ওর দিকে। "এতো সিম্পল না ব্যাপারটা।"

"জানি," তাকাহাশি বলল। "আসলেই এতো সিম্পল না...আচ্ছা, তোমার কি শীত লাগছে?"

"না, ঠিক আছি আমি।"

হাতের স্যান্ডউইচ থেকে আরেক টুকরো ছিঁড়ে মারি বেড়ালটাকে খাওয়ালো। বেড়াল কয়েক কামড়ে সাবড়ে দিলো টুকরোটা।

তাকাহাশি ইতস্তত করলো কয়েক মুহূর্ত, যেন একটা কথা বলা উচিত কিনা বুঝতে পারছে না। শেষমেষ সিদ্ধান্ত নিলো যে বলেই ফেলবে।

"জানো, তোমার বোন আর আমি একবার অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছি।"

মারি আবার তাকালো ওর দিকে। "কবে?"

"জানি না, এপ্রিলের দিকে বোধহয়। টাওয়ার রেকর্ড দোকানে যাচ্ছিলাম কী যেন কিনবো বলে। এমন সময় এরি'র সাথে দেখা হয়। আমি একাই ছিলাম, ওর সাথেও কেউ ছিলো না। কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাবিজাবি কথা হলো, তারপর একটা ক্যাফেতে বসলাম আমরা। প্রথমদিকে শুধু পুরনো দিনের কথা হচ্ছিলো, আগেকার ক্লাসমেটদের সাথে দেখা হলে যা হয় আরকি। কিন্তু তারপর এরি বলল আমাদের কোথাও যেয়ে একটু গলা ভেজানো উচিত। সেখান থেকে আমরা সিরিয়াস বিষয়ে কথা বলা শুরু করলাম। ওর অনেককিছু বলার ছিলো।"

"সিরিয়াস বিষয়? মানে ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপার?"

"হ্যা।"

মারি চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো। "এরি তোমার সাথে এসব নিয়ে কথা বলেছে? কেন? তোমার সাথে যে ওর এতো কাছের সম্পর্ক সেটা তো কোনোদিন মনে হয়নি।"

"না না, আমাদের সম্পর্ক কখনোই বেশি কাছের ছিলো না। হোটেলের পুলে যেদিন গিয়েছিলাম সেদিনই প্রথমবার ঠিক করে কথা হয়েছিলো ওর সাথে। ও আমার পুরো নাম জানতো বলেও মনে হয় না।"

মারি কিছু বলল না। বেড়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

"কিন্তু সেদিন," তাকাহাশি বলল, "ওর কাউকে দরকার ছিলো। ওর কথা শুনবে এমন কেউ। অন্য কোনো মেয়ে হলে সবচেয়ে ভালো হতো বোধহয়। আমি জানি না, তোমার বোনের হয়তো কোনো মেয়ে বন্ধু নেই, থাকলেও এসব নিয়ে কথা বলা যায় এমন কেউ নেই। তাই আমাকে বলছিলো। আমি স্পেশাল কেউ না, আমার জায়গায় অন্য অনেকেই থাকতে পারতো।"

"তারপরেও, তুমিই কেন? ওর তো বয়ফ্রেন্ডের অভাব ছিলো না।"

“না, সেটা ছিলো না।”

“হ্যা। কিন্তু তোমার সাথে ওর হঠাৎ রাস্তায় দেখা হলো–মানে তুমি, যাকে ও ভালো করে চেনেও না, আর সেখান থেকে এতোকিছু বলে ফেললো এরি? কেন? কারণ কী হতে পারে?”

একটু চিন্তা করলো তাকাহাশি। “জানি না। হয়তো ও ভেবেছিলো আমাকে বললে ভয় নেই।”

“মানে?”

“হ্যা, মানে আমাকে গোপন কথা বললে পরে সেটা নিয়ে টেনশন করতে হবে না।”

“কীরকম? কেন ও সেটা মনে করবে?”

“আচ্ছা, মানে...ব্যাপারটা...” তাকাহাশির যেন কথাটা বলতে কষ্ট হচ্ছে। “আচ্ছা, একটু আজব লাগতে পারে, কিন্তু অনেকেই আমাকে গে মনে করে। মাঝেমধ্যে এমনও হয়েছে যে রাস্তায় অপরিচিত ছেলেরা লাইন মেরেছে আমাকে।”

“কিন্তু তুমি তো গে না, তাই না?”

“না, আমার মনে হয় না...তবে অনেকেই দেখেছি ওদের গোপন কথাবার্তা বলার ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করে। ছেলে হোক, মেয়ে হোক, আমার কাছের বন্ধু হোক বা দূরের, সবাই। যেসব কথা জীবনে আর কাউকে বলেনি সেগুলো নিয়ে আমার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে পারে। কেন কে জানে। এমন না যে আমি শুনতে চাই আগ বাড়িয়ে।”

মারি একটু ভেবে দেখলো বিষয়টা। তারপর বলল: “আচ্ছা, বেশ। এরি অনেককিছু বলেছে তোমাকে যেগুলো আগে কাউকে বলেনি।”

“ঠিক।”

“যেমন?”

“যেমন ওর ফ্যামিলি'র ব্যাপারে কথাবার্তা।”

“কীরকম?”

“ধরো উদাহরণ হিসেবে...” তাকাহাশি শেষ করলো না বাক্যটা।

“আমার ব্যাপারেও বলেছে?”

“হ্যা।”

“কী বলেছে?”

তাকাহাশি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে দেখলো কিভাবে বলা উচিত

কথাগুলো। "ধরো বলেছে যে ওর আফসোস আছে তোমাকে নিয়ে। তোমার সাথে সম্পর্কটা আরেকটু ভালো হলে খুশি হতো।"

"আরেকটু ভালো?"

"ওর মনে হচ্ছিলো তোমাদের মাঝখানে গ্যাপ চলে এসেছে। দূরত্ব। তুমি ইচ্ছে করে সেটা বাড়িয়েছো। আগে এমন ছিলে না, কিন্তু একটু বড় হবার পর।"

মারি দুই হাতে বেড়ালটাকে জড়িয়ে ধরলো। ছোট্ট শরীরের উষ্ণতা অনুভব করলো।

"ঠিক।" ও বলল। "কিন্তু মাঝখানে একটু দূরত্ব থাকলেও দু'জন মানুষের সম্পর্ক ভালো হতে পারে।"

"অবশ্যই পারে।" তাকাহাশি বলল। "কিন্তু একজনের কাছে যেটা একটু দূরত্ব সেটা অন্যজনের কাছে মাইলের পর মাইল লম্বাও মনে হতে পারে।"

কোত্থেকে যেন একটা বড়সড় বাদামি রঙের বেড়াল উদয় হলো। মাথা ঘষতে শুরু করলো তাকাহাশির পায়ে। তাকাহাশি পকেট থেকে মাছের কেক বের করলো। প্যাকেট খুলে কেকটার আধখানা ছুঁড়ে দিলো বেড়ালটার দিকে। এক মুহূর্তে বেড়াল গিলে নিলো খাবারটা।

"এটাই ছিলো এরি'র সিরিয়াস বিষয়?" মারি জিজ্ঞেস করলো। "যে ছোট বোনের সাথে ওর সম্পর্ক ভালো না?"

"এটা একটা বিষয়। আরো ছিলো।"

মারি জবাব দিলো না।

"আমার সাথে যে সময় ওর কথা হয়েছিলো," তাকাহাশি বলল, "এরি অনেক ধরনের ওষুধ খাচ্ছিলো তখন। ব্যাগভর্তি পিল আর ক্যাপসুল। একটা ব্লাডি মেরি খাচ্ছিলো টেবিলে বসে, সাথে ওষুধ চিবাচ্ছিলো মুড়ির মতন। এতো ওষুধ ওকে ডাক্তাররা খেতে বলেছিলো নাকি সন্দেহ আছে আমার।"

"হ্যা, ও আগে থেকেই অনেক ওষুধ খেতো। কিছু হলেই। এটা বেড়েছে সময়ের সাথে সাথে।"

"ওকে কারও থামতে বলা উচিত।"

মারি মাথা নাড়লো। "ওষুধ, ডায়েটিং আর হাত দেখানো–এগুলো এরি'র নেশা। কেউ থামাতে পারবে না।"

"আমি আকারে-ইঙ্গিতে বলেছিলাম যে ওর ডাক্তার দেখানো উচিত–মানে সাইকাইয়াট্রিস্ট আরকি। কিন্তু সেটা করার কোনোরকম ইচ্ছা ওর ছিলো বলে মনে হয়নি। মানে, ও বোধহয় এটাও বোঝেনি যে ওর কোনো সমস্যা হচ্ছে। আমার অনেক চিন্তা হচ্ছিলো ওকে নিয়ে। বসে বসে ভাবছিলাম: এরি আসাই এমন হয়ে গেলো কবে?"

মারি ভ্রু কুঁচকালো। "তুমি পরে ওকে একটা কল দিলেই পারতে। সরাসরি জিজ্ঞেস করতে–এতোই যদি চিন্তা থাকে তোমার।"

তাকাহাশি ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "আমাদের আজ প্রথম যে ব্যাপারে কথা হয়েছিলো ভুলে গেছো? যদি তোমাদের বাসায় ফোন করে দেখতাম এরি আসাই ধরেছে, আমি বুঝতামই না কী বলা উচিত।"

"কিন্তু তোমরা একসাথে ড্রিংক করেছো, এতো কথা বলেছো..."

"ঠিক আছে, কিন্তু আমি সেদিন শুধু শুনেছি আসলে। ও বলে যাচ্ছিলো, আমি চুপ করে ছিলাম। মাঝেমধ্যে হুঁ-হাঁ করছিলাম। আর সত্যি কথা বলতে, এরি'র জন্য আমি খুব বেশি কিছু করতে পারবো বলে মনে হয় না। সেটা চাইলে ওকে আরো ভালো করে চিনতে হবে, কাছ থেকে দেখতে হবে।"

"তুমি সেটা চাও না?"

"মনে হয় না চাইলেও পারবো।" তাকাহাশি বলল। হাত বাড়িয়ে বেড়ালের কানের পাশে চুলকে দিলো ও। "আমার হয়তো সেই যোগ্যতাই নেই।"

"নাকি আগ্রহ নেই?"

"উলটোটাও কিন্তু হতে পারে। এরি আসাইয়ের হয়তো আমার ওপর আগ্রহ নেই। বললাম না, ও সেদিন শুধু এমন একজনকে চেয়েছিলো যে চুপ করে ওর কথা শুনবে। ওর কাছে আমি একজোড়া কান ছাড়া আরকিছু ছিলাম না।"

"ঠিক আছে, সেসব বাদ দিলাম। এরি'র ব্যাপারে তোমার ইন্টারেস্ট আছে কিনা সেটা বলো। সিরিয়াস ইন্টারেস্ট। হ্যা বা না উত্তর দেবে।"

তাকাহাশি একটু বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে দুই হাতের তালু ঘষলো। প্রশ্নটা জটিল। এতো সোজাসাপ্টা জবাব দেয়া যাচ্ছে না।

"হ্যা, বোধহয় এরি আসাইয়ের ব্যাপারে আমি ইন্টারেস্টেড। তোমার বোনের একটা...আভা আছে। একটা আলো। খুব কম মানুষের মধ্যেই এমন দেখেছি আমি। আমি শিওর যে জন্ম থেকেই ওর এই আলোটা

আছে। একটা উদাহরণ দিই: যখন আমরা ড্রিংক করছিলাম তখন বারের সবাই একটু পর পর আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলো। ভাবটা ছিলো যে এতো সুন্দরি একটা মেয়ের সাথে এমন গাধা টাইপের ছেলে কী করছে?"

"আচ্ছা, কিন্তু–"

"আচ্ছা, কিন্তু?"

"ভেবে দেখো," মারি বলল। "আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তোমার সিরিয়াস ইন্টারেস্ট আছে কিনা। তুমি বললে 'বোধহয় আমি ইন্টারেস্টেড'। সিরিয়াস ব্যাপারটা ফেলে দিলে। মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা এড়িয়ে যাচ্ছো।"

তাকাহাশি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালো মারি'র দিকে। "তুমি দেখি সবকিছু খেয়াল করো।"

মারি চুপচাপ জবাবের জন্য অপেক্ষা করছে।

কী বলা উচিত সে ব্যাপারে তাকাহাশি আবার একটু বিভ্রান্ত। "কিন্তু...ধরো...তোমার বোনের সাথে যেদিন অনেকক্ষণ কথা হলো, সেদিন একটু আজব লাগছিলো আমার। প্রথমে খেয়াল করিনি যে ব্যাপারটা আজব। কিন্তু যতো দিন যাচ্ছে, সেটাকে আরো অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছিলো ও আমার সামনে বসে আছে, আবার একই সময় অনেক, অনেক মাইল দূরে।"

এবারও মারি জবাব দিলো না। আস্তে করে ঠোঁট কামড়ালো। গল্পটা শেষ হোক।

তাকাহাশি আরো কিছুক্ষণ সময় নিয়ে কথাগুলো গুছিয়ে নিলো।

"আর আমি যা বলছিলাম," ও শুরু করলো আবার, "মনে হচ্ছিলো ওকে ঘিরে রেখেছে কোনোকিছু। কাঁচের মতো...না, ঠিক কাঁচ না। ধরো চোখে দেখা যায় না এমন কোনো স্পঞ্জ ঘিরে রেখেছিলো ওকে। আমি যা বলছিলাম তার থেকে সব অর্থ শুষে নিচ্ছিলো স্পঞ্জটা, এরি'র কান পর্যন্ত পৌছাতে দিচ্ছিলো না। যতো সময় যাচ্ছিলো, ততো পরিষ্কার হচ্ছিলো ব্যাপারটা।" একবার দম নিলো তাকাহাশি। "কিছুক্ষণ পর মনে হচ্ছিলো এরি'র মুখ থেকে বের হওয়া শব্দগুলোও অর্থ হারাচ্ছে। খুব আজব।"

স্যান্ডউইচ শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে বেড়ালটা লাফ দিয়ে মারি'র হাত থেকে নেমে গেলো। এক ছুটে হারিয়ে গেলো ঝোপঝাড়ের মধ্যে। একটা টিস্যু দিয়ে মারি স্যান্ডউইচ ধরে রেখেছিলো। সেটাকে মুড়িয়ে নিজের

ব্যাগে রেখে দিলো। হাত ঝাড়া দিলো পাউরুটির গুঁড়ো পরিষ্কার করার জন্য।

তাকাহাশি ওর দিকে তাকালো। "বুঝতে পারছো কি বলছি?"

"বুঝতে পারছি কিনা?" বলে মারি একটা নিশ্বাস নিলো। "তুমি যা বললে সেটা অনেক আগে থেকেই আমার মনে হয়। এরি'র আশেপাশে থাকলেই মনে হয়। গত কয়েক বছর ধরে।"

"যে তুমি যা বলছো সেটা ওর কান পর্যন্ত পৌছাচ্ছে না?"

"হ্যা।"

তাকাহাশি'র হাতে যেটুকু কেক বাকি ছিলো সেটা ছুঁড়ে দিলো একটা বেড়ালের দিকে। বেড়াল সেটা সাবধানে শুঁকলো একবার, তারপর দ্রুত চিবাতে শুরু করলো।

"আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাই।" মারি বলল। "কিন্তু তোমার সত্যি করে বলতে হবে।"

"ঠিক আছে।" তাকাহাশি বলল।

"অ্যালফাভিলে তুমি যে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়েছিলে সে আমার বোন ছিলো না তো?"

তাকাহাশি প্রায় চমকে গেলো। সরাসরি মারি'র চেহারায় নিবদ্ধ হলো ওর দৃষ্টি। মনে হলো পুকুরে ছড়িয়ে পড়া ঢেউ দেখছে।

"এটা তোমার কেন মনে হলো?"

"জানি না, মনে হলো এমনি। ভুল বলেছি?"

"না, এরিকে নিয়ে যাইনি। অন্য একটা মেয়ে ছিলো।"

"শিওর তুমি?"

"আমি শিওর।"

মারি একমুহূর্ত কী যেন ভাবলো। "তোমাকে কী আরেকটা প্রশ্ন করতে পারবো?"

"অবশ্যই।"

"ধরো তুমি আমার বোনকে নিয়ে গিয়েছিলে ওই হোটেলে। ওর সাথে সেক্স করেছো। ধরো, ঠিক আছে?"

"ধরলাম।"

"আর ধরো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আসলে ওই হোটেলে আমার বোনকে নিয়ে সেক্স করেছো কিনা।"

"ধরলাম।"

"তুমি কি সত্যি বলতে? যদি উত্তরটা হ্যা হতো?"

তাকাহাশি একটু ভেবে দেখলো। "না বোধহয়।" বলল তারপর। "বলতাম না।"

"কেন?"

"এরি কার সাথে শুয়েছে সেটা ওর ব্যাপার। আমার সাথে হলে তো আরও বলতাম না।"

"কেন?"

"এমনি। আমি এসব মেয়েদের নাম অন্য কাউকে বলতে পছন্দ করি না।"

"সাইকায়াট্রিস্টদের মতো?"

"হ্যা, ওইরকমই।"

"ঠিক আছে, তাহলে তোমার উত্তর হওয়া উচিত 'আমি বলবো না'। মিথ্যে বলার কী দরকার?"

"যদি বলি বলবো না, তাহলে তুমি ধরে নেবে উত্তরটা হ্যা-ই ছিলো।"

"তার মানে সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, তোমার উত্তর হতো না, ঠিক?"

"ধরতে পারো, হ্যা।"

মারি তাকাহাশির চোখের দিকে তাকালো। "সত্যি বলতে এটা নিয়ে আমার তেমন মাথাব্যথা নেই। তুমি এরি'র সাথে শুলে আমার কিছু আসে যায় না–যদি ওকে জোর না করে থাকো।"

"এরি আসাই কী চায় সেটা এরি আসাই নিজেও জানে না। যাই হোক, এটা নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। এতোকিছু ধরতেও ভালো লাগছে না। অ্যালফাভিলে আমি যে মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলাম সে এরি ছিলো না।"

মারি ছোট একটা নিশ্বাস ফেললো। কাটতে দিলো কয়েকটা সেকেন্ড। তারপর বলল: "আমারও মনে হয় এরি আর আমার সম্পর্ক আরেকটু ভালো হওয়া উচিত। বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই এ চিন্তাটা ঢুকেছে আমার মাথায়। যে আমি ওর বেস্ট ফ্রেন্ড হতে চাই। ওর মতো হওয়ারও চেষ্টা করেছি কিছুটা। কিন্তু তখনো এরি অনেক ব্যস্ত থাকতো। ম্যাগাজিনের কভারের জন্য ছবি তোলাতে যেতো, হাজার হাজার জিনিস শেখার জন্য কোচিং করতো, ওকে ঘিরেও রাখতো হাজার হাজার মানুষ। আমার জন্য কোনো সময় ছিলো না এরি'র। যখন ওকে সবচেয়ে বেশি দরকার ছিলো,

তখন ও আমার কাছে আসতে পারেনি।”

তাকাহাশি চুপ করে কথাগুলো শুনলো।

“আমরা দুই বোন বড় হচ্ছিলাম একই ছাদের নিচে, কিন্তু আলাদা জগতে। আমরা যে খাবার খেতাম সেটা পর্যন্ত আলাদা ছিলো। ওর এতো অ্যালার্জি-ট্যালার্জির কারণে অনেক বুঝেশুনে থেকে হতো।”

একটু বিরতি।

তারপর মারি বলল: “আমি ওকে দোষ দিচ্ছি না। এটা ঠিক যে মা কিছু ব্যাপারে ওকে লাই দিয়ে মাথায় তুলেছিলো, তবে এখন এসবে কিছু আসে যায় না আমার। শুধু বলতে চাচ্ছি যে আমাদের মাঝখানে একটা...লম্বা ইতিহাস আছে। এখন যে শুনছি যে ও আমার সাথে ভালো সম্পর্ক চায়, সেটা শুনে আমি কী করবো? কী করা উচিত? বুঝতে পারছো আমার কথা?”

“হ্যা বোধহয়।”

মারি কিছু বলল না।

“ব্যাপারটা আমার হঠাৎ মাথায় এসেছে, এরি’র সাথে কথা বলার সময়।” তাকাহাশি বলল। “কিন্তু আমার মনে হয় ওর কোনো একটা সমস্যা আছে, যে সমস্যার সাথে তুমি জড়িত। অনেক আগে থেকেই।”

“সমস্যা?” মারি বলল। “এরি’র, আমাকে নিয়ে?”

“হ্যা।”

“তার চেয়ে আমার ওকে নিয়ে সমস্যা হবার সম্ভাবনা বেশি না? সেটা মনে হয়নি তোমার?”

“না।”

“কেন?”

“আচ্ছা, দেখো–তুমি হচ্ছো ছোট বোন, তাও আগে থেকেই তুমি জানতে জীবন থেকে কী চাও। যেখানে দরকার সেখানে না বলতে পেরেছো, নিজের তালে বড় হয়েছো। কিন্তু এরি সেটা করতে পারেনি। ছোটবেলা থেকেই ওর ওপর একটা চরিত্র চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। চাপিয়ে দিয়েছে আশেপাশের সব মানুষ। এই নরমসরম রাজকুমারী চরিত্রটা ধরে রাখার জন্য এরি’র অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। সবাই ওকে নিয়ে অনেক নাচানার্চি করতো এটা ঠিক, সারাক্ষণ ওর কথা বলতো–কিন্তু সেটা যে ওর জন্য খুব ভালো কিছু ছিলো তা না। জীবনের যে সময়টাতে আমরা

নিজেদের খুঁজে পাই, নিজেদের ব্যাপারে একটা নিজস্ব ধারণা বানাই, সে সময়টা ওকে দেয়া হয়নি। 'সমস্যা' বললে হয়তো বেশি বলা হয়, তবে আমার ধারণা এরি'র সামান্য হিংসা ছিলো তোমাকে নিয়ে।"

"ও বলেছে সেটা?"

"না, তবে যা বলছিলো সেটা শুনে মনে হয়েছে আমার।"

"হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি বাড়িয়ে বলছো।" মারি মাথা নাড়লো। "এটা হয়তো ঠিক যে আমি এরি'র চেয়ে বেশি স্বাধীনতা পেয়েছি জীবনে। ঠিক আছে। কিন্তু তার কারণে কী হয়েছে সেটা দেখো: আমাকে কেউ চেনে না, আমার কোনো ক্ষমতা নেই, কোনো গুরুত্ব নেই। যেটুকু জানার কথা সেটুকু জানি না, খুব যে বুদ্ধি আছে আমার সেটাও বলার উপায় নেই। আমার চেহারা ভালো না, আমাকে নিয়ে কারো তেমন মাথাব্যথাও নেই। তুমি যে 'নিজেকে খুঁজে পাওয়ার' কথা বললে, সেটা আমি করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। আমার ছোট একটা দুনিয়া আছে, এটা ঠিক। সেখানেই আমি ঘুরে বেড়াই, এখান থেকে ওখানে যাই, হোঁচট খাই। আমাকে দেখে এরি'র হিংসা হবে কেন?"

"তুমি এখনো নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার স্টেজে আছো।" তাকাহাশি বলল। "হয়তো কয়েকদিন পরে বুঝতে পারবে তুমি কী চাও।"

"ওই মেয়েটার বয়সও উনিশ বছর ছিলো।" মারি বলল।

"কোন মেয়ে?"

"অ্যালফাভিলের চাইনিজ মেয়েটা। যাকে মেরে রক্ত বের করে দেয়া হয়েছে। মেয়েটার চেহারা নষ্ট হয়নি, এখনো সুন্দর। কিন্তু ও যে দুনিয়াতে থাকে সেখানে কোনো 'গুছিয়ে নেয়ার স্টেজ' নেই।"

তাকাহাশি চুপচাপ মাথা ঝাঁকালো।

মারি বলল: "ওকে দেখার সাথে সাথে আমার মনে হয়েছে—মানে আমার ভেতর ধাক্কার মতো লেগেছে একটা কথা—যে আমি ওর বান্ধবী হতে চাই। হয়তো অন্য কোনো জায়গায়, অন্য কোনো সময়ে দেখা হলে আসলেই তাই হতো। খুব কম মানুষের ব্যাপারেই আমার এমন মনে হয়েছে। কখনোই না বোধহয়।"

"হুঁ।"

"কিন্তু আমার কী মনে হয় সেটাতে কিছু আসে যায় না। আমার আর ওর দুনিয়া অনেক আলাদা। আর সেটা নিয়ে আমার কিছু করার নেই।

যতোই চেষ্টা করি, কিছুই বদলাবে না।"

"ঠিক।"

"তবে তোমাকে এটা বলতে পারি: ওর সাথে আমার বেশি সময় কাটানো হয়নি। বেশি কথা বলারও সুযোগ ছিলো না। কিন্তু মনে হচ্ছে ও কোনোভাবে আমার ভেতরে ঢুকে গেছে। আমার অংশ হিসেবে। জানি না কথাটা বোঝাতে পারছি কিনা।"

"তুমি ওর কষ্টটা বুঝতে পারছো।"

"হতে পারে।"

তাকাহাশি গম্ভীর মুখে ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর বলল: "একটা বুদ্ধি পেয়েছি। ব্যাপারটা এভাবে দেখলেই তো হয়: যে তোমার বোনকে অ্যালফাভিলের মতো কোনো জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে। কেউ ওর ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে, কোনো কারণ ছাড়াই। ওর চিৎকার কেউ শুনতে পারছে না, রক্ত কেউ পাচ্ছে না।"

"মানে...রূপক অর্থে?"

"হতে পারে।" তাকাহাশি জবাব দিলো।

"এরি'র সাথে কথা বলে তোমার সেটা মনে হয়েছে?"

"ও নিজের ঘাড়ে অনেকগুলো সমস্যার বোঝা নিয়ে ঘুরছে। কোনো সমাধান পাচ্ছে না। ওর হেল্প দরকার। সেটা বলতেও পারছে না কাউকে। ভেতরে চেপে রাখা কথাগুলো বোঝানোর জন্য নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে। এটা শুধু আন্দাজ নয়, আমি মোটামুটি শিওর।"

মারি উঠে দাঁড়ালো বেঞ্চ ছেড়ে, আকাশের দিকে তাকালো। তারপর পার্কের দোলনাগুলোর একটার দিকে এগিয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্তে জন্য রাতের বাতাস জীবন্ত হয়ে উঠলো ওর জুতোয় চাপা পড়া শুকনো পাতার শব্দে। দোলনার মোটা দড়িগুলোকে স্পর্শ করলো মারি, যেন দেখছে শক্ত কিনা। তারপর বসলো একটা দোলনায়।

তাকাহাশিও বেঞ্চ ছেড়ে এগিয়ে এলো। বসে পড়লো মারি'র পাশের দোলনাতে।

"এরি ঘুমাচ্ছে এখন।" মারি বলল, যেন কোনো গোপন কথা ফাঁস করছে। "অনেক গভীর ঘুম।"

"সবাই ঘুমাচ্ছে এখন। কতো রাত দেখেছো?"

"না, সে কথা বলিনি।" মারি মাথা নাড়লো। "ও জাগতে চায় না।"

অধ্যায় ১২

শিরাকাওয়া'র অফিস।

ও মেঝেতে শুয়ে আছে। কোমড়ের ওপর থেকে সম্পূর্ণ নগ্ন। যোগব্যায়ামের মাদুর বিছিয়ে নিয়েছে মেঝেতে, সেটাতে শুয়ে সিট-আপ দিচ্ছে। শার্ট আর টাই চেয়ারে ঝোলানো। চশমা আর ঘড়ি সাজানো ডেস্কে।

শিরাকাওয়ার গড়ন হালকাপাতলা। কিন্তু ওর ছাতি চওড়া, আর পেটে কোনো মেদ নেই। পেশিগুলো দৃঢ়, উন্নত। খালি গায়ে ওকে দেখতে অনেক অন্যরকম লাগছে। নিশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন, শোয়া থেকে উঠে বসছে। একবার ডানে, একবার বাঁয়ে। সাদা আলোতে চকচক করছে বুক আর কাঁধের ঘাম।

ডেস্কে রাখা একটা সিডি প্লেয়ার থেকে ব্রায়ান আসাওয়া'র স্কারলেটি ক্যানটাটা বাজছে। গানটা ধীরগতির, শান্ত। এই ব্যায়ামের সাথে মানাচ্ছে না। কিন্তু খেয়াল করলে বোঝা যায় শিরাকাওয়ার নড়াচড়ার সাথে গানের ছন্দের মিল আছে। সম্ভবত প্রতিদিনই এমন করে শিরাকাওয়া। বাসা থেকে অফিস যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে। ওর ব্যায়ামের ছন্দ মাপা, আত্মবিশ্বাসী।

বেশ কয়েকবার এমন ওঠানামা করার পর শিরাকাওয়া থামলো। যোগব্যায়ামের মাদুরটা গোল করে ভাঁজ করলো, তারপর রেখে দিলো অফিসের একটা লকারে। সেখান থেকে একটা ছোট তোয়ালে আর শেভিং কিট বের করলো ও, সেগুলো নিয়ে বাথরুমে চলে এলো।

এখনো শিরাকাওয়া খালি গায়ে। প্রথমে চেহারা ধুলো পানি দিয়ে, তারপর তোয়ালে দিয়ে মুছলো। একই তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছলো শরীর থেকে। ব্যায়ামের মতোই এখনো ওর সব কাজ মাপা। বাথরুমের দরজা খোলা রেখেছে. সেদিক দিয়ে ভেসে আসছে স্কারলেটির সুর। মাঝে মাঝে গুনগুন করে সতেরশ' শতাব্দীর সেই মিউজিকের সাথে তাল মেলাচ্ছে শিরাকাওয়া।

শেভিং কিট থেকে বডি স্প্রে-এর একটা ছোট বোতল বের করলো। দ্রুত দুই বগলের নিচে স্প্রে করলো। তারপর নাক নিয়ে শুঁকে দেখলো যে গন্ধ আছে কিনা।

ও বেশ কয়েকবার নিজের ডান হাত খুললো, আবার বন্ধ করলো। আঙুলগুলো নাড়িয়ে দেখলো তিন-চার বার। তালুর পেছনদিকে চেক করলো ফুলে গেছে কিনা বোঝার জন্য। দেখলে অতোটা বোঝা যায় না, কিন্তু এখনো যথেষ্ট ব্যথা হচ্ছে।

শেভিং কিট থেকে একটা ছোট চিরুণি বের করলো শিরাকাওয়া, তারপর চুল আঁচড়ে নিলো। সামনের দিকে চুল পড়ে যাচ্ছে ওর, কিন্তু কপালের আকৃতি সুন্দর হওয়াতে দেখতে খারাপ লাগে না।

আঁচরানো শেষ করে ও চশমা পরলো। শার্টের বোতাম লাগালো আস্তে আস্তে, তারপর গলায় টাই পরলো। ফ্যাকাশে ধূসর শার্ট, গাঢ় নীল রঙের টাই। আয়নাতে দেখে কলার ঠিকঠাক করে নিলো শিরাকাওয়া।

ও আয়নায় নিজের চেহারা দেখলো ভালো করে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো, দৃষ্টি প্রখর। চেহারার একটা পেশিও কাঁপলো না। ওর হাতদু'টো সিংকের ওপর রাখা। নিশ্বাস আটকে রেখেছে ও, চোখের পাতা ফেলছে না। হয়তো এভাবে তাকিয়ে থাকলে কিছু একটা বেরিয়ে আসবে। অন্য কিছু। যেটা ওর সব ঈন্দ্রিয়কে স্থির করে দেবে, চ্যাপ্টা করে দেবে চেতনা। থেমে যাবে যুক্তি, জমে যাবে সময়। চেষ্টা করছে শিরাকাওয়া। চেষ্টা করছে নিজের সত্তাকে আশেপাশের দৃশ্যের সাথে মিশিয়ে ফেলতে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একটা বস্তুতে পরিণত হতে।

কিন্তু যতোই চেষ্টা করুক, সেই *অন্যকিছু* কিছুতেই আসছে না। আয়নাতে ওর প্রতিবিম্বটা ওরই প্রতিবিম্ব। বাস্তবের প্রতিচ্ছবি।

হাল ছেড়ে দিয়ে শিরাকাওয়া একটা লম্বা নিশ্বাস নিলো, তারপর সোজা হলো। পেশিগুলোতে ঢিল দিয়ে ও দুইবার মাথা ঘুরিয়ে নিলো। তারপর সিংক থেকে তুলে নিলো নিজের জিনিসপত্র, ব্যাগে ভরে নিলো। তোয়ালেটা মুড়িয়ে ছুঁড়ে মারলো ডাস্টবিনের দিকে। বাথরুম থেকে বের হওয়ার আগে লাইটটা নিভিয়ে দিলো, আস্তে করে লাগিয়ে দিলো দরজা।

শিরাকাওয়া চলে গেছে বাথরুম থেকে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যায়নি। আমরা অপেক্ষা করছি এখানে, স্থির, এক জায়গায়, ক্যামেরার মতো।

তাকিয়ে আছি আয়নার দিকে। শিরাকাওয়ার প্রতিবিম্ব সেখান থেকে সরেনি।

প্রতিবিম্বটা এদিকে তাকিয়ে আছে, আয়নার ওপাশ থেকে। নড়ছে না সে, অভিব্যক্তি বদলাচ্ছে না। তীব্র দৃষ্টি তাক করা সামনের দিকে।

একসময় যেন হাল ছেড়ে দেয়ার মতো নিজেকে ঢিল দিলো প্রতিবিম্ব। তারপর হাত তুলে নিজের গাল ঘষলো, যেন রক্তমাংসের ছোঁয়ার সাথে সে পরিচিত নয়।

শিরাকাওয়া নিজের ডেস্কে বসে আছে। ভাবছে। আঙুলের ফাঁকে ঘোরাচ্ছে একটা রূপালী রঙের পেন্সিল। এরি আসাই ঘুম থেকে ওঠার পর যে পেন্সিলটা দেখেছিলো, সেটাই। ভোঁতা শিষ, সাইডে ভেরিটেক লেখা।

পেন্সিল নিয়ে কিছুক্ষণ খেলার পর শিরাকাওয়া জিনিসটাকে ডেস্কে নামিয়ে রাখলো। ডেস্কে একটা ট্রে আছে, সেটার ওপর ঠিক একই রকম দেখতে আরো ছ'টা পেন্সিল রাখা। এগুলোর শিষ ধার করা হয়েছে নিখুঁতভাবে।

শিরাকাওয়া বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। একটা বাদামি ব্রিফকেসে কিছু কাগজ ভরলো, তারপর গায়ে চরালো কোট। শেভিং কিট যে লকার থেকে বের করেছিলো সেখানে রেখে দিলো আবার। একটা বড় শপিং ব্যাগ রাখা ছিলো রুমের এক পাশে, সেটা হাতে করে ডেস্কের কাছে নিয়ে এলো। একটা চেয়ার টেনে বসলো, তারপর ব্যাগ থেকে বের করতে লাগলো একের পর এক কাপড়। অ্যালফাভিলের চাইনিজ মেয়েটার যে পোশাকগুলো চুরি করে এনেছে, সেগুলো।

ক্রিম রঙের পাতলা একটা কোট। লাল রঙের জুতো। জুতোজোড়ার তলি ক্ষয়ে গেছে। গাঢ় গোলাপী রঙের একটা সোয়েটার। সুতির কাজ করা সাদা রঙের ব্লাউজ। একটা টাইট নীল মিনিস্কার্ট। কালো লেগিংস। টকটকে গোলাপী আন্ডারওয়্যার, সিন্থেটিক লেস বসানো।

পোশাকগুলো দেখে যৌন উত্তেজনা হয় না। মন খারাপের মতো একটা অনুভূতি হয়। ব্লাউজ আর আন্ডারওয়্যারে কালো রক্ত লেগে আছে। একটা সস্তা ঘড়ি। নকল লেদারের তৈরি কালো হ্যান্ডব্যাগ।

শিরাকাওয়ার চেহারায় একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি। যেন পোশাকগুলোকে এই ব্যাগে দেখে অবাক হয়েছে। বিভ্রান্ত ভাব। সাথে একটু অখুশি। ওর অবশ্যই মনে আছে অ্যালফাভিলে কী করে এসেছে। যদি ভুলে যাবার

চেষ্টাও করে, হাতের ব্যথাটা ভুলতে দেবে না। কিন্তু এই কাপড়ের টুকরোগুলো অর্থহীন লাগছে ওর কাছে, আবর্জনা মনে হচ্ছে। ওর জীবনে এসব ন্যাকড়ার দরকার কি?

তবে থামলো না শিরাকাওয়া। সাবধানে, তবে একটু যেন অনিচ্ছার সাথে গুছিয়ে রাখতে লাগলো অতীতের এই টুকরোগুলোকে।

হ্যান্ডব্যাগটা খুলে উপুর করে ধরলো ডেস্কের ওপর। ঝরঝর করে বেরিয়ে এলো রুমাল, টিস্যু, মেকআপ বক্স, লিপস্টিক, আইলাইনার, ছোটখাটো কসমেটিক্স। তারপর কয়েকটা লজেন্স, ভ্যাসলিনের কৌটো, কনডমের প্যাকেট, দু'টো স্যানিটারি ন্যাপকিন। একটা ছোট স্প্রে ক্যান। মরিচের স্প্রে। সম্ভবত কোনো কাস্টমার মারামারি শুরু করলে যেন আত্মরক্ষা করতে পারে, সেজন্য কিনেছিলো মেয়েটা (শিরাকাওয়ার কপাল ভালো যে ব্যাগ থেকে বের করার সময় পায়নি)।

সস্তা কানের দুল, ব্যান্ড-এইড, ওষুধের কৌটো। বাদামি লেদারের পার্স। পার্সের ভেতর তিনটা দশ হাজার ইয়েনের নোট চোখে পড়লো প্রথমে। শিরাকাওয়া এগুলো মেয়েটাকে দিয়েছিলো রাতের শুরুতে। আরো কয়েকটা নোট আছে, আর কয়েকটা পয়সা। একটা ফোন কার্ড, সাবওয়ে ট্রেনের ছেঁড়া টিকেট। বিউটি পার্লারের রিসিট।

কোনোকিছু দেখেই মেয়েটার পরিচয় আন্দাজ করা সম্ভব নয়। শিরাকাওয়া ইতস্তত করলো, তারপর তিন হাজার ইয়েন ভরলো নিজের পকেটে। আমিই তো দিয়েছিলাম, ও ভাবলো। ফেরত নিতেই পারি।

ব্যাগে একটা মোবাইল ফোনও আছে। নকিয়া ফোন, ফ্লিপ সেট। ছোটখাটো। প্রিপেইড সিম। এই ফোনের কল ট্র্যাক করা যায় না। একটা সিস্টেম করা আছে, কেউ কল করলে কয়েকবার রিং হয়ে তারপর নিজে থেকেই রিসিভ হয়ে যায়। মেসেজ হিসেবে রেকর্ড হয়ে থাকে তাদের কথা।

শিরাকাওয়া একটা মেসেজ চালালো। চাইনিজ ভাষা। আরো কয়েকটা চালিয়ে দেখলো, কিন্তু সবগুলোই চাইনিজ ভাষায়। রাগত সুরে কথা বলছে কেউ, কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে। মেসেজগুলো বেশি লম্বা নয়। শিরাকাওয়া একটাও বুঝতে পারলো না। কিন্তু সবগুলো শুনলো। শেষ হওয়ার পর ফোন অফ করে দিলো।

ফোন বাদে বাকি সবকিছু কাগজে মুড়িয়ে নিলো ও, তারপর ভরলো

কালো প্লাস্টিকের ব্যাগে। এসব ব্যাগে আবর্জনা ফেলা হয়, যেন গন্ধ না ছড়ায়। তারপর ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেললো।

ফোনটা রয়ে গেলো ডেস্কের ওপর। সেটা আরেকবার তুললো ও, দেখলো, তারপর আবার রেখে দিলো। যেন বুঝতে পারছে না জিনিসটা নিয়ে কী করা উচিত।

সিডি প্লেয়ার অফ করে দিলো ও। তারপর ডেস্কের নিচের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ড্রয়ার লক করলো। রুমাল বের সাবধানে চশমার কাঁচ মুছলো। চশমা আবার চোখে দিয়ে তুলে নিলো ডেস্কে রাখা ল্যান্ড ফোনের রিসিভার। একটা ট্যাক্সি সার্ভিসের নম্বর ডায়াল করে তাদের বলল যেন এ ঠিকানায় ট্যাক্সি পাঠিয়ে দেয়। তারা জানালো যে দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে।

কোট রাখার স্ট্যান্ড থেকে একটা ফ্যাকাশে ধূসর ওভারকোট নামালো শিরাকাওয়া, গায়ে চরালো। মেয়েটার মোবাইল ভরলো নিজের পকেটে। তারপর ব্রিফকেস আর প্লাস্টিকের ব্যাগটা তুলে নিলো।

দরজায় দাঁড়িয়ে ও পুরো ঘরে চোখ বুলালো একবার। কিছু ভুলে যায়নি তো? না। লাইট অফ করে দিলো শিরাকাওয়া। সবগুলো আলো নিভে যাওয়ার পরও রুম পুরোপুরি অন্ধকার হলো না। রাস্তার বিলবোর্ড আর স্ট্রিটলাইট থেকে আলো চুঁইয়ে ঢুকছে ঘরের ভেতর।

করিডরে বেরিয়ে ও দরজা বন্ধ করে দিলো। হাঁটার সময় প্রতিধ্বনি হলো ওর পদক্ষেপের। লম্বা, গভীর হাই তুললো শিরাকাওয়া। যেন বোঝাতে চাচ্ছে: "যাক, আরেকটা লম্বা দিন শেষ।"

লিফটে করে নিচে নেমে এলো ও। বিল্ডিং-এর প্রধান দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো, তারপর সেটার দরজাতেও তালা মারলো। ওর প্রতি নিশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসছে ঘন, সাদা মেঘ। অপেক্ষা করছে শিরাকাওয়া।

একটু পরে একটা ট্যাক্সি চলে এলো। মাঝবয়সি ড্রাইভার জানালা খুলে জিজ্ঞেস করলো: "আপনি মিস্টার শিরাকাওয়া?" তার চোখ গেলো শিরাকাওয়ার হাতে ধরা প্লাস্টিক ব্যাগের দিকে।

"চিন্তা করার কিছু নেই," শিরাকাওয়া বলল। "আপনার গাড়ি গন্ধ হবে না। আর একটু পরেই ব্যাগটা ফেলে দেবো।"

"সমস্যা নেই।" ড্রাইভার বলল। "আসুন।" গাড়ির দরজা খুলে দিলো

সে।

শিরাকাওয়া ঢুকলো গাড়ির ভেতর। "আমার ভুল না হয়ে থাকলে...আপনাকে বোধহয় আগেও এই গাড়িতে নিয়েছি স্যার। এমন সময়েই। আপনার বাড়ি কি একোদাতে?"

"সেটার কাছেই। তেতসুগাকুদো।"

"ওহ হ্যা, তেতসুগাকুদো। আজকেও কি সেখানে যাচ্ছেন?"

"হ্যা। একটাই বাড়ি আমার, সেখানে না গিয়ে উপায় নেই।"

"বাড়ি আসলে একটাই হয় স্যার।" ড্রাইভার বলল। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। "কিন্তু এতো রাত পর্যন্ত কাজ করতে খারাপ লাগে না আপনার?"

"দেশের যে অবস্থা, সবারই তো টানাটানি চলছে। ওভারটাইম না করে পরিবার চালানোর উপায় নেই।"

"আমারও একই কাহিনি।" ড্রাইভার বলল। "যতো কম কাজ, ততো কম কামাই। তারপরেও, আমার চেয়ে বোধহয় আপনার অবস্থা একটু ভালো। কোম্পানি অন্তত আপনার ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দেয়।"

"হ্যা, কিন্তু তার বদলে আমাকে দিয়ে লেটে কাজ করায়। আর রাতে ট্যাক্সি ভাড়া না দিলে আমি বাসায় যেতে পারবো না, বাসায় যাওয়ার উপায় না থাকলে বেশি কাজ করবো না। তাই এই ব্যবস্থা।" শিরাকাওয়া তিক্ত হাসি দিলো।

তারপর ওর মনে পড়লো। "ওহ্ আচ্ছা, ভুলেই গেছিলাম। আপনি কি এই সামনের মোড়ে আমাকে নামিয়ে দেবেন? দোকানে যেতে হবে। বৌ কয়েকটা জিনিস নিয়ে যেতে বলেছে। বেশিক্ষণ লাগবে না।"

ড্রাইভার রিয়ারভিউ মিরর দিয়ে ওর দিকে তাকালো। "ওখানে দাঁড়ালে পরে অনেকখানি সামনে থেকে ঘুরে আসতে হবে। সামনে আরো বেশ কয়েকটা দোকান পড়বে। সেগুলোর কোনোটাতে নামলে হয় না?"

"বৌ যেটা চেয়েছে সেটা মোড়ের দোকান ছাড়া পাওয়া যাবে না আসলে। তাছাড়া আমার এই ময়লা ফেলা দরকার।" শিরাকাওয়া হাতের প্লাস্টিক ব্যাগ উঁচু করলো।

"ঠিক আছে, সমস্যা নেই। মিটারে একটু বেশি আসবে, জানিয়ে রাখলাম আরকি।"

গাড়ি ডানে মোড় নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলো। পার্ক করলো এক

জায়গায়। ব্যাগ হাতে শিরাকাওয়া বের হলো। এখানে সেভেন-ইলেভেন নামে একটা দোকান আছে। সামনে স্তুপ করে রাখা অনেকগুলো আবর্জনার ব্যাগ। শিরাকাওয়া নিজেরটাও দিয়ে দিলো সেখানে। এতোগুলো একরকম ব্যাগের মাঝে ওরটা প্রায় সাথে সাথে হারিয়ে গেলো। আগামীকাল ময়লা ফেলার লোক এসে সবগুলো নিয়ে যাবে। যেহেতু দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এমন কিছু নেই, কাকেরা এসে শিরাকাওয়ার ব্যাগ ছিঁড়বে না। শেষ একবার স্তুপের দিকে চোখ বুলিয়ে ও দোকানে ঢুকলো।

কোনো কাস্টমার নেই ভেতরে। কাউন্টারে বসে আছে এক তরুণ, গভীর মনোযোগ দিয়ে ফোনে কথা বলছে। দোকানে বাজছে সাদার্ন অল স্টার্স নামে একটা ব্যান্ডের গান।

যে তাকে দুধের প্যাকেট থাকে শিরাকাওয়া সেই তাকটার দিকে এগিয়ে গেলো। তুলে নিলো তাকানাশি লো-ফ্যাট দুধের একটা প্যাকেট। এক্সপায়ারি ডেটটা দেখলো একবার। ঠিক আছে। এবার ও নিলো এক কৌটো ইয়োগার্ট। হঠাৎ মনে পড়লো যে চাইনিজ মেয়েটার মোবাইল ফোন এখনো ওর পকেটে। একবার চারপাশে দেখে নিলো শিরাকাওয়া। কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না নিশ্চিত হওয়ার পর ফোনটাকে রেখে দিলো এই তাকে। প্যাকেটগুলোর মাঝে ছোট্ট ফোনটা যেন অনেকখানি মানিয়ে গেছে। যেন এখানেই জিনিসটার থাকার কথা। শিরাকাওয়ার হাত ছেড়ে বেরিয়ে দোকানের অংশ হয়ে গেছে।

কাউন্টারে এসে দুধ আর ইয়োগার্টের দাম চুকালো ও, তারপর তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি কাছে ফিরে এলো।

"পেয়েছেন যেটা দরকার?" ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, কাজ হয়ে গেছে।"

"ভালো। এখন তাহলে সোজা তেতসুগাকুদো।"

"আমি ঘুমিয়ে যেতে পারি রাস্তায়, হ্যা? কাছাকাছি আসলে ডেকে দেবেন। একটা গ্যাস স্টেশন পড়বে সামনে। সেটার একটু পরেই আমি নামবো।"

"জি, স্যার। ঘুমান আপনি।"

শিরাকাওয়া দুধ আর ইয়োগার্ট সিটে নামিয়ে রাখলো, তারপর হাত ভাঁজ করলো বুকের ওপর। চোখদু'টো বন্ধ হয়ে এলো।

হয়তো ঘুম আসবে না এখন, কিন্তু ড্রাইভারের সাথে গল্প করতে ইচ্ছে করছে না। চোখ বন্ধ করে এমন কিছু ভাবার চেষ্টা করলো যেটাতে বিরক্তি আসবে না। সাধারণ কিছু একটা, যেটার কোনো গভীর অর্থ নেই। কিন্তু মাথায় কোনো চিন্তা আসছে না। শূন্যতা, আর ডান হাতের ব্যথা। হৃদস্পন্দনের সাথে তাল মিলিয়ে দপদপ করছে সে ব্যথা। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বাজছে কানে। অদ্ভুত, শিরাকাওয়া ভাবলো। আশেপাশে কোথাও তো সমুদ্রের নামগন্ধও নেই।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ট্যাক্সি একটা ট্রাফিক সিগনালে থামলো। বড় চৌরাস্তা। ট্যাক্সির ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই চাইনিজ লোকটার কালো হোন্ডা মোটরসাইকেল। ওদের মাঝখানে হয়তো দুই ফিটেরও দূরত্ব নেই। কিন্তু চাইনিজ লোকটা সোজা তাকিয়ে আছে। শিরাকাওয়ার দিকে একবারও তার দৃষ্টি পড়লো না। শিরাকাওয়া নিজের সিটে এলিয়ে আছে, দু'চোখ বন্ধ। ওর কানে এখনো বাজছে সমুদ্রের গান।

সিগনালের লাইট বদলে সবুজ হলো। মোটরসাইকেল একছুটে চলে গেলো সামনে। ট্যাক্সি সে তুলনায় আস্তে আস্তে আগালো, যেন শিরাকাওয়ার ঘুম না ভেঙে যায়। কিছুক্ষণ পরে গাড়িটা এই এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

অধ্যায় ১৩

মারি আর তাহাকাশি এখনো পার্কের দোলনায় বসে আছে। তাকাহাশি তাকিয়ে আছে মারি'র দিকে। ওর অভিব্যক্তি বিভ্রান্ত। যেন কিছু একটা বুঝতে পারছে না। আগে যে বিষয়ে কথা বলছিলো সেটার কারণে খুব সম্ভবত।

"ও ঘুম থেকে উঠতে চায় না?"

মারি কিছু বলল না।

"মানে কী?" তাকাহাশি আবার জিজ্ঞেস করলো।

মারি চুপ করেই রইলো, নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন জবাব দেয়া উচিত কিনা সে ব্যাপারে মনস্থির করতে পারছে না। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য ও প্রস্তুত নয়।

"চলো একটু হেঁটে আসি।" ও বলল।

"ঠিক আছে, চলো। হাঁটি। হাঁটলে শরীর ভালো থাকে। আস্তে আস্তে হাঁটা, আর অনেক পানি খাওয়া। ব্যস, শরীর থাকবে চমৎকার।"

"কী বলছো এসব?"

"আমার জীবনের...যেটাকে ইংরেজরা বলে 'মটো'। আমার মটো হচ্ছে আস্তে আস্তে হাঁটা, আর অনেক পানি খাওয়া।"

মারি এক ভ্রু উঁচু করলো। আজব মটো। তবে বলল না কথাটা। কিছু জিজ্ঞেসও করলো না। দোলনা থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলো। তাকাহাশিও তাই করলো। পার্ক ছেড়ে বেরিয়ে এলো দু'জনে। সামনে এক জায়গায় আলো দেখা যাচ্ছে। সেদিকে হাঁটতে লাগলো।

"স্কাইলার্কে ফেরত যাচ্ছো?" তাকাহাশি জানতে চাইলো।

মারি মাথা নাড়লো দু'দিকে। "রেস্টুরেন্টে বসে বসে বই পড়তে আর ভালো লাগছে না।"

"হ্যা, বুঝতে পেরেছি।" তাকাহাশি বলল।

"আমি আবার অ্যালফাভিলে যেতে চাই।"

“চলো, এগিয়ে দিই তোমাকে। আমি যেখানে প্র্যাকটিস করছি সেটা অ্যালফাভিলের কাছেই।”

“কাওরু বলেছিলো যে আমি যখন ইচ্ছা যেতে পারি, কিন্তু এখন গেলে বিরক্ত হবে কিনা কে জানে।”

তাকাহাশি মাথা নাড়লো এবার। “নাহ্, ওর মুখ খারাপ, কিন্তু মনটা অনেক ভালো। যদি বলে থাকে যে তুমি যখন ইচ্ছা যেতে পারো, আসলেই যখন ইচ্ছা যেতে পারো।”

“আচ্ছা।”

“তাছাড়া রাতের এ টাইমে ওদের কিছু করারও থাকে না। তোমাকে দেখলে খুশি হবে।”

“তুমি তোমার ব্যান্ডের সাথে বাজাতে যাচ্ছো আবার?”

তাকাহাশি নিজের ঘড়ির দিকে তাকালো। “আজকের পরে বোধহয় আর সারারাত প্র্যাকটিস করা হবে না। ভালো করে বাজানো উচিত।”

ওরা পাড়ার মাঝে চলে এলো আবার। রাস্তায় কেউই নেই প্রায়, থাকার কথাও নয়। অনেক রাত হয়ে গেছে। চারটা বাজে। এ সময় শহরের ব্যস্ততায় ঢিল পড়ে।

রাস্তায় অনেক ধরনের জিনিস পড়ে আছে: বিয়ারের ক্যান, মোচড়ানো খবরের কাগজ, কার্ডবোর্ডের ছেঁড়া বাক্স, প্লাস্টিকের বোতল, চ্যাপ্টা সিগারেট। একটা গাড়ির হেডলাইটের ভাঙা অংশবিশেষ। বমিও দেখা যাচ্ছে এক জায়গায়। একটা বড়, নোংরা বেড়াল আবর্জনায় ভর্তি ব্যাগ শুঁকছে। ইঁদুর বা কাক হামলা করার আগেই ব্যাগের গুপ্তধনের একটা ভাগ চায় সে।

রাস্তার বেশিরভাগ নিয়ন লাইট নষ্ট হয়ে গেছে, তাতে স্পষ্ট হয়েছে একটা দোকানের ওপরের জ্বলজ্বলে অক্ষর। পার্ক করা গাড়িগুলোর উইন্ডশিল্ড ওয়াইপারের নিচে বিভিন্ন কাগজ গোঁজা। ওগুলো লিফলেট, দোকান-টোকানের বিজ্ঞাপন। একটু দূরের হাইওয়ে থেকে ভেসে আসছে ভারি ট্রাকের গম্ভীর গুঞ্জন। রাস্তা ফাঁকা থাকে এ সময়, ট্রাক চালানোর জন্য সেরা।

মারি মাথার ক্যাপটা টেনে কপাল পর্যন্ত নামিয়ে এনেছে। দুই হাত জ্যাকেটের পকেটে ঢোকানো। তাকাহাশিকে অনেক লম্বা লাগছে ওর পাশে।

“তোমার এই ক্যাপটা তো রেড সক্স দলের, না?” তাকাহাশি জিজ্ঞেস করলো। রেড সক্স আমেরিকার বিখ্যাত বেসবল দলগুলোর একটা।

“হ্যা।

“তুমি রেড সক্সের ফ্যান?”

“আমি বেসবলের ব্যাপারে কিছুই জানি না।”

“তাহলে?”

“একজন গিফট দিয়েছিলো।”

“আচ্ছা।” তাকাহাশি বলল। “আমারও বেসবলের ব্যাপারে তেমন কিছু জানা নেই। তবে ফুটবল দেখি।” একটু থেমে যোগ করলো: “আচ্ছা, আমরা তোমার বোনের ব্যাপারে কথা বলছিলাম।”

“হুঁ।”

“আমি ঠিক বুঝিনি ব্যাপারটা। ও জাগতে চায় না মানে?”

মারি চোখ তুলে তাকালো। “সরি। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে এটা নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ব্যাপারটা একটু জটিল।”

“আচ্ছা।”

“অন্যকিছু নিয়ে কথা বলো।”

“কী রকম?”

“যা ইচ্ছা।” মারি বলল। “তোমার ব্যাপারে বলো।”

“আমার ব্যাপারে?”

“হুঁ।”

তাকাহাশি একটু চিন্তা করলো। “বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।”

“ঠিক আছে, তাহলে মন খারাপ হয়ে যায় এমন কিছু বলো।”

“আমার মা মারা গেছে যখন আমার বয়স সাত বছর।” তাকাহাশি বলল। “ব্রেস্ট ক্যান্সার। ডাক্তাররা সময়মতো বুঝতে পারেনি। বোঝার পর মা আর বেশিদিন ছিলেন না, মাত্র তিন মাস। অনেক তাড়াতাড়ি ছড়িয়েছে অসুখটা, ট্রিটমেন্ট দেয়ার সুযোগ ছিলো না। বাবা সেই সময় ছিলো জেলে। বলেছি তো।”

মারি আবার তাকাহাশির দিকে তাকালো।

“তোমার সাত বছর বয়সে মা মারা গেছে? আর বাবা তখন জেলে ছিলো?”

"ঠিক।"

"তুমি একা ছিলে?"

"হ্যা। বাবাকে দুই বছরের জেল দেয়া হয়েছিলো। সে একটা পিরামিড স্কিম চালাচ্ছিলো, ডেস্টিনি'র মতো। মানুষের টাকা নিয়ে বলতো তাদের বড়লোক বানিয়ে দেবে, নানা হাবিজাবি। ছাত্র অবস্থায়ও বাবা একবার গ্রেফতার হয়েছিলো, রাজনীতি করতে যেয়ে। জাজ কোনোভাবেই তাকে দুই বছরের কম দিতে রাজি হয়নি। মা একবার জেলে নিয়ে গিয়েছিলো আমাকে, বাবার সাথে দেখা করার জন্য। ভয়াবহ ঠাণ্ডা ছিলো জায়গাটা। বাবাকে আটকানোর ছয় মাস পর মা জানতে পারে তার ক্যান্সার হয়েছে। সাথে সাথেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে, কিন্তু লাভ হয়নি, যা বললাম। কিছুদিনের জন্য এতিম হয়ে গিয়েছিলাম আমি। বাবা জেলে, মা হাসপাতালে।"

"তখন তোমার দেখাশোনা কে করতো?"

"বাবার ফ্যামিলি হাসপাতালের টাকাপয়সা দিচ্ছিলো, আমার থাকার খরচও ওরাই দিয়েছে। বাবার সাথে ওরা কথা বলতো না, কিন্তু সাত বছর বয়সি একটা ছেলেকে ওরা ফেলে দিতে পারেনি। আমার এক ফুপি প্রতিদিন বাসায় আসতেন। খুব যে খুশি হয়ে আসতেন তা না, কিন্তু দায়িত্বটা মেনে নিয়েছিলেন। এলাকার লোকজনও বেশ সাহায্য করেছে তখন। একেকদিন একেকজন আসতো। কেউ কাপড় ধুয়ে দিতো, আবার কেউ বাজার করে দিতো, রান্না–সবকিছু। তখন যে পাড়ায় থাকতাম সেটা একটু গরীব ছিলো, তাতে ভালোই হয়েছে। এসব পাড়ায় লোকজন অন্যদের খোঁজখবর রাখে। তারপরেও, বেশিরভাগ সময় একাই থাকতাম। নিজে নিজে স্কুলের জন্য রেডি হতাম, সহজ কয়েকটা রান্নাও শিখে নিয়েছিলাম। আমার ভালো করে মনে নেই অবশ্য। ভাবলে মনে হয় এসব অন্য কারো সাথে হয়েছে, আমার সাথে না।"

"তোমার বাবা ফিরেছে কবে?"

"মা মারা যাওয়ার মাস তিনেক পরে বোধহয়। এই খবর শুনে বাবাকে একটু আগে ছেড়ে দিয়েছিলো পুলিশ। সে আসছে শুনে অনেক খুশি হয়েছিলাম আমি। নিজেকে এতিম-এতিম লাগছিলো না আর। আর যাই হোক, বাবা মানে বড় একজন মানুষ। আমার আর কষ্ট করে নিজের খেয়াল

রাখা লাগবে না।”

“সেটা ঠিক।”

“ফেরার দিন সে পরে এসেছিলো একটা পুরনো টুইডের কোট। সেটা থেকে যে তামাকের গন্ধ বের হচ্ছিলো আমার এখনো মনে আছে।”

তাকাহাশি পকেট থেকে হাত বের করে নিজের ঘাড়ের পেছনে বুলালো।

“কিন্তু বাবা আসার পরও মনে হচ্ছিলো না যে বাসায় বড় কেউ আছে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা একটু কঠিন। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হতো আমাকে কেউ ঠকাচ্ছে। যেন আমার আসল বাবা গায়েব হয়ে গেছে, আর তার জায়গায় কাজ চালানোর জন্য পাঠানো হয়েছে নতুন কাউকে। নতুন লোকটা বাবার মতো দেখতে, কিন্তু বাবা আসলে বাবা না। বোঝাতে পারছি?”

“মোটামুটি।”

তাকাহাশি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেলো। তারপর বলল: “যাই হোক, তখন আমার এমন লাগতো প্রায়ই। যে যতো যা-ই হয়ে থাকুক, বাবার আমাকে একা ফেলে যাওয়া উচিত হয়নি। আমাকে এতিম বানানো উচিত হয়নি। কারণ যা-ই হোক, যতোগুলোই হোক, তার জেলে যাওয়ার কোনো অধিকার ছিলো না তখন। আমার বয়স মাত্র সাত বছর ছিলো, মাত্র সাত। জেল কী জিনিস বুঝতামও না ঠিকমতো। মনে হতো বড় একটা ড্রয়ারের মতো জিনিস–অন্ধকার, ভয়াবহ। আমার বাবা কেন এমন একটা জায়গায় থাকবে?”

তাকাহাশি থামলো। তারপর মারিকে জিজ্ঞেস করলো: “তোমার বাবা কখনো জেলে গেছেন?”

মারি মাথা নাড়লো। “না মনে হয়।”

“তোমার মা?”

“না মনে হয়।”

“তোমার কপাল ভালো। এসব যে তোমার জীবনে আসেনি, সেটা খুব ভালো।” তাকাহাশি হাসলো। “অবশ্য এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামাও না বোধহয় তুমি।”

“না, আগে কখনো ভাবিনি।”

“বেশিরভাগ মানুষই ভাবে না। আমি ভাবি।”

মারি চোখের কোণ দিয়ে তাকালো তাকাহাশির দিকে।

" তোমার বাবার তারপরে আর কোনোদিন জেলে যেতে হয়েছে?"

"না, পরে আর এসব হয়নি। হলেও আমি জানি না। বাবা যেমন মানুষ, তার সহজে দুই নাম্বারি ছেড়ে দিতে পারার কথা না। তবে জেলে যাওয়ার মতো ভুল আর করেনি। একবার যেয়েই বুঝেছে জায়গাটা কতো খারাপ। কে জানে, এমনও হতে পারে সে আমাকে নিয়ে একটু চিন্তা করতো তখন। বা আমার মরা মা-কে নিয়ে। যাই হোক, জেল থেকে বের হওয়ার পর সে ব্যবসা শুরু করে। অনেক আপ-ডাউন হয় সেই ব্যবসায়, মাঝে মাঝে অনেক লাভ, মাঝে মাঝে প্রচুর লস। একদম রোলার কোস্টার। একবার আমাদের একটা মার্সিডিজ গাড়ি ছিলো, ড্রাইভারসহ। আরেকবার আমাকে সাইকেল কিনে দেয়ার টাকা ছিলো না বাবার কাছে। একবার ভাড়া বাসা থেকে মাঝরাতে পালাতে হয়েছে, ভাড়া দেয়ার ক্ষমতা ছিলো না দেখে। এক জায়গায় এমনিতেও বেশিদিন থাকতাম না আমরা। আমার কোনো বন্ধু বানানোর সুযোগ ছিলো না। ছয় মাস পর পর বাড়ি পালটানো লাগতো। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত মোটামুটি এভাবেই গেছে।"

তাকাহাশি আবার কোটের পকেটে হাত পুরলো। এমন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো যেন বাজে স্মৃতি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

"এখন অবশ্য সে কিছুটা শান্ত হয়েছে।" ও বলল। "একটা শক্ত ভাব এসেছে চেহারা-চরিত্রে। যুদ্ধের পরে জন্মানো বাচ্চাদের চেহারায় যেটা আসে, বড় হলে। রোলিং স্টোন্স-এর গান শুনেছো?"

মারি মাথা ঝাঁকালো।

"ওদের লিডার মিক জ্যাগার আগে কতো বিদ্রোহী টাইপের একটা লোক ছিলো। রকস্টার যাকে বলে। কারো কথা শুনতো না, মুখ খারাপ করতো, জিনিসপত্র ভাংচুর করতো। আর এখন তার মধ্যেও কেমন যেন একটা 'সম্মানীত' ভাব চলে এসেছে। সবাই 'স্যার' বলে ডাকে। বাবার মধ্যেও এই ব্যাপারটা আছে। এটা বোধহয় ওদের জেনারেশন-এর ব্যাপার। খুব বেশি চিন্তা করে না ওরা, কিন্তু ভুল করলে সেটা থেকে শিক্ষা নেয়। আমি জানি না এখন সে কী করছে, জিজ্ঞেস করি না, সে বলেও না। কিন্তু আমার ইউনিভার্সিটি ফি দিতে সে একবারও দেরি করে না। মুড ভালো থাকলে আমাকে হাতখরচও পাঠায়। এটা নিয়েও কিছু জিজ্ঞেস করি

না। মাঝেমধ্যে সবকিছু না জানাই ভালো।"

"তোমার বাবা বিয়ে করেছেন আবার বললে না?"

"হ্যা, মা মারা যাওয়ার চার বছর পরে। একা একা বাচ্চা বড় করার ক্ষমতা ছিলো না তার।"

"নতুন বৌয়ের বাচ্চাকাচ্চা নেই?"

"নাহ্, শুধু আমি। এজন্যেই হয়তো সৎ মা আমাকে নিজের ছেলের মতো দেখতো। আমি এটা কোনোদিন ভুলবো না। অনেক আদর করতো আমাকে। ওর সাথে যা ঝামেলা আছে সব আমার তরফ থেকে, ওর দিক থেকে না।"

"কিসের ঝামেলা?"

তাকাহাশি ছোট্ট করে হাসলো, তারপর তাকালো মারি'র দিকে। "একবার এতিম হয়ে গেলে তারপর সারাজীবন এতিম হয়েই থাকতে হয়। আমি বার বার একই স্বপ্ন দেখি। আমার বয়স সাত বছর হয়ে গেছে, আবার সেই এতিম জীবন কাটাচ্ছি। বড় কেউ নেই, আমি সম্পূর্ণ একা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আলো কমে আসছে। নেমে আসছে রাত। প্রতিবার একই জিনিস দেখি। আমার বয়স সাত বছর। মাথার সফ্টওয়্যারে ভাইরাস ঢুকে গেছে, বুঝলে।"

মারি চুপ করে রইলো।

"এখন এসব নিয়ে বেশি চিন্তা করি না সাধারণত।" তাকাহাশি বলল। "ভেবে লাভ নেই। জীবন বাঁচতে হয় একদিন একদিন করে, সবসময় পুরনো চিন্তা ঘাঁটাকে বাঁচা বলে না।"

"জীবন মানে অনেক হাঁটা, আস্তে আস্তে পানি খাওয়া।"

"না," তাকাহাশি মাথা নাড়লো। " আস্তে আস্তে হাঁটা, আর অনেক পানি খাওয়া।"

"একই তো কথা।"

তাকাহাশি ব্যাপারটা ভেবে দেখলো। "হুঁ, হতে পারে।"

দু'জনই চুপ করে গেলো এবার। নীরবে হাঁটতে লাগলো। বাতাসের গায়ে দাগ ফেলছে ওদের বাষ্পাচ্ছন্ন নিশ্বাস। একটা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠলো ওরা, চলে এলো হোটেল অ্যালফাভিলের সামনে। ক্যাটক্যাটে নিয়ন আলোটা মারি'র চোখে পরিচিত আর বন্ধুত্বপূর্ণ লাগলো।

তাকাহাশি দরজায় দাঁড়িয়ে সরাসরি মারি'র দিকে তাকালো। চেহারায় একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে।

"আচ্ছা," ও বলল। "কথাটা বলেই ফেলি।"

"কিসের কথা?"

"তুমি যা ভাবছো আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু আজ রাতে হবে না বোধহয়। আমার পরনে আন্ডারওয়্যারটা ধোয়া না।"

মারি বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়লো। "ফালতু জোক মেরো না তো, প্লিজ। আমার ভালো লাগে না।"

তাকাহাশি হাসলো। "ছয়টার সময় এসে তোমাকে নিয়ে যাবো, ঠিক আছে? তুমি চাইলে একসাথে নাস্তা করতে পারি আমরা। এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, দারুণ অমলেট বানায়। গরম গরম, ফ্রেশ। ওহ্, তোমার কি অমলেট নিয়ে কোনো সমস্যা আছে? মানে ডিমের জন্য মুরগিদের কষ্ট দেয়া হয়, ওদেরকে নিষ্ঠুর খাঁচায় রাখা হয়–এসব জিনিসপত্র?"

মারি এক মুহূর্ত চিন্তা করলো। "জানি না। তবে মাংসতে সমস্যা থাকলে ডিমেও থাকতেই পারে।"

"সর্বনাশ," তাকাহাশি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "সবকিছু নিয়েই তো সমস্যা দেখা যাচ্ছে।"

"আমার অমলেট ভালোই লাগে অবশ্য।"

"ঠিক আছে, তাহলে এই একবার একটু কম্প্রোমাইজ করে ফেলো। এ রেস্টুরেন্টের অমলেট আসলেই ভালো।"

মারি'র উদ্দেশ্যে একবার হাত নেড়ে তাকাহাশি হাঁটতে শুরু করলো। প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছে। মারি মাথার ক্যাপটা ঠিক করে নিয়ে হোটেলে ঢুকে পড়লো।

অধ্যায় ১৪

এরি আসাইয়ের রুম।

টিভি চালু আছে। এরি এখনো ঘুমানোর পোশাক পরা। স্ক্রিনের ওপাশ থেকে তাকিয়ে এদিকে দেখার চেষ্টা করছে। কপালে লুটিয়ে পড়েছে একগোছা চুল। মাথা ঝাঁকিয়ে চুলটা সরিয়ে দিলো ও। কাঁচে দুই হাতের তালু ঠেকালো, তারপর জোরে জোরে চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করলো। যেন একজন মানুষ ভুলে কোনো অ্যাকুয়ারিয়ামের ভেতর ঢুকে পড়েছে। বাইরের লোকজনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে কাঁচ ভেদ করে। কিন্তু ওর গলা বাইরে আসছে না। মোটা কাঁচ পার করতে পারছে না শব্দের কম্পন।

এরিকে দেখে মনে হচ্ছে ওর অবশ ভাবটা এখনো কাটেনি। শরীরে পুরো শক্তি ফিরে আসেনি। হয়তো ওর ঘুম এতো লম্বা আর গভীর ছিলো দেখে। তারপরেও এরি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বোঝার চেষ্টা করছে ওর সাথে কী হচ্ছে। বিভ্রান্তি আর দুর্বোধ্যতার থাবায় ধরা পড়েছে, কিন্তু নিজের সমস্ত ক্ষমতা খাটিয়ে বের হতে চাচ্ছে সেই ফাঁদ থেকে। ওকে ঘিরে রেখেছে যে জায়গা, সেটার যুক্তি বুঝতে চাইছে। গলা না শোনা গেলেও চেহারায় দেখা দিয়েছে অস্থিরতার ছাপ।

অবশ্য ও যে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করছে এমন নয়। আগে করছিলো, সেটা করতে করতে ক্লান্ত এখন। আন্দাজ করতে পেরেছে যে ও ডাক কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

এখন এরি'র কাজ একটাই। যা কিছু দেখছে, যা শুনছে, সবকিছুকে গুছিয়ে এক-একটা নাম দিচ্ছে ওর মস্তিষ্ক। নামগুলোর অর্ধেক ওর জন্য, অর্ধেক আমাদের জন্য। ওর ঠোঁট নড়ছে, বিড়বিড় করছে, কিন্তু পুরো শব্দটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যেন অপরিচিত কোনো ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করছে এরি। বাক্য যা উচ্চারণ করছে সবগুলোই খুব সংক্ষিপ্ত, শব্দগুলোর মাঝে মাঝে অনেকখানি শূন্যতা। এই শূন্যতার গর্তে পড়ে যেন হারিয়ে যাচ্ছে সব কথার অর্থ।

কাঁচের যেদিকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেদিক থেকে আমরা এরিকে দেখছি মনোযোগ দিয়ে। কিন্তু ওর ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারছি না কী বলছে। যেভাবে বালুঘড়ির ভেতর সড়সড় করে পিছলে পড়ে বালু, সেভাবে ওর আঙুলের ফাঁক গলে পিছলে যাচ্ছে বাস্তবতা। সময় নেই ওর হাতে, সময় নেই।

কিছুক্ষণ পর ও ক্লান্ত হয়ে মুখ বন্ধ করে ফেললো। যে নীরবতা আগেই ভিড় জমিয়ে রেখেছিলো ঘরের বাতাসে, তার সাথে জড়ো হলো নতুন এক নিস্তব্ধতা।

এরি'র হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেলো। একের পর এক কিল মারতে লাগলো ও নিজের দিকের কাঁচে। তাও শব্দ এলো না এদিকে।

মনে হচ্ছে টিভি স্ক্রিনের এপাশে কী আছে তা দেখতে পাচ্ছে এরি আসাই। ওর চোখ যেভাবে নড়ছে তা দেখে আন্দাজ করা যায়। এদিকে, ওর বেডরুমে যে জিনিসগুলো রাখা, ওর দৃষ্টি সেগুলোকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ডেস্ক, বিছানা, বুককেস। এই রুম ওর পরিচিত। এখানেই ওর থাকার কথা। এ মুহূর্তে এই বিছানায় ঘুমিয়ে থাকার কথা। কিন্তু স্বচ্ছ এ সীমানা ভেদ করে এতো কাছের ঘরে আসাটাও ওর জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিছু একটা–কোনো ইচ্ছাশক্তি, কোনো অস্তিত্ব–ওকে নিয়ে গেছে সেই অপার্থিব ঘরে, সেখানে আটকে রেখেছে। এরি'র দুই চোখে একাকীত্বের স্পর্শ লেগেছে, যেন শান্ত হ্রদের পানিতে প্রতিফলিত ধূসর মেঘ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ওর জন্য কিছু করতে পারবো না। কথাটা আবার বলতে হচ্ছে: কিন্তু আমরা শুধু দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আর কিছু নই। যা ঘটছে সেসবে কোনো প্রভাব ফেলার ক্ষমতা নেই আমাদের।

কিন্তু–আমরা ভাবছি এখন–সেই মানুষটা কে ছিলো? চেহারাবিহীন মানুষটা? এরিকে সে কী করেছে? এখন সে কোথায়?

হঠাৎ, কোনো উত্তর পাবার আগেই, টিভি স্ক্রিনটা আবার ঝিরঝির করতে লাগলো। এরি ঝাপসা হলো, কাঁপতে শুরু করলো। ওর শরীরে কিছু হচ্ছে টের পেয়ে ও দ্রুত আশেপাশে চোখ বুলালো। প্রথমে ছাদের দিকে তাকালো, তারপর মেঝের দিকে। শেষে চোখ ফেললো নিজের ঝাপসা হয়ে আসা হাতের দিকে। হাতগুলোর প্রান্ত যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। এরি'র চেহারায় ফুটে উঠছে অস্বস্তি। কী হচ্ছে ওর সাথে?

ঝিরঝির শব্দ বেড়েই চলেছে। যেন পাহাড়ের গায়ে ফুঁসে উঠেছে অদম্য বাতাস। দুই জগতকে একসাথে বেঁধে রেখেছে যে সুতো, সেটা গিঁট যেন খুলে আসছে। এরিকে মুছে দেয়ার চেষ্টা করছে। ওর শরীরের বাস্তবতা ধ্বংসের মুখে।

"পালাও!" আমরা ওকে চিৎকার করে বলছি। আমরা ভুলে গেছি যে পর্যবেক্ষণ বাদে আর কিছু করা উচিত নয় আমাদের। কিন্তু আমাদের কণ্ঠ পৌঁছাচ্ছে না এরি'র কান পর্যন্ত।

তবে ও নিজেই দেখতে পাচ্ছে বিপদটা। পালানোর চেষ্টা করছে। দ্রুত পা চালিয়ে সরে গেলো এরি, হয়তো কোনো দরজার দিকে। ক্যামেরার নাগালের বাইরে চলে গেলো। টিভিতে যে ছবি দেখছিলাম আমরা সেটা দুমড়ে গেলো, কুঁচকে গেলো, কিছুক্ষণ পর প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে শুরু করলো পিকচার টিউবের আলো। স্ক্রিনে শুধু আলোর তৈরি একটা ছোট্ট চারকোণা বাক্স রইলো কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর নিভে গেলো সেটাও।

সব তথ্য হারিয়ে গেছে শূন্যতার গভীরে। কোথায় আছি আমরা বোঝা যাচ্ছে না, কোনোকিছুর অর্থ বোঝা যাচ্ছে না। দুই বিশ্ব আলাদা হয়ে গেছে। পেছনে ফেলে গেছে শুধু এক নিস্তব্ধতা। যে নিস্তব্ধতার কোনো অবয়ব নেই, যেখানে টিকতে পারে না কোনো অনুভূতি।

অন্য এক জায়গা, সেখানে অন্য এক ঘড়ি। ঘড়িটা বৈদ্যুতিক, দেয়ালে ঝোলানো। কাঁটা দেখে মনে হচ্ছে সাড়ে চারটা বেজে গেছে। এটা শিরাকাওয়ার বাড়ির রান্নাঘর। নাস্তার টেবিলে শিরাকাওয়া একা বসে আছে। ওর শার্টের কলারের বোতাম খোলা, টাই ঢিলে করে নিয়েছে। ইয়োগার্ট খাচ্ছে চামচ দিয়ে। মিষ্টি দইটা সরাসরি প্লাস্টিকের ডিব্বা থেকে মুখে চালান করছে শিরাকাওয়া। রান্নাঘরে ছোট একটা টিভি আছে, সেটা দেখছে। রিমোট কন্ট্রোল ইয়োগার্টের ডিব্বার পাশেই।

সমুদ্রের নিচে কী আছে না আছে তা নিয়ে একটা অনুষ্ঠান চলছে টিভিতে। বিচিত্র সব প্রাণী। কুৎসিত, সুন্দর, শিকারী, শিকার। ছোট্ট একটা সাবমেরিন ভেসে বেড়াচ্ছে সেই গহীনে। শক্তিশালী আলো বসানো তার গায়ে, একপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে লম্বা, ধাতব হাত।

অনুষ্ঠানটার নাম *গভীর জলের মাছ*। শিরাকাওয়া মিউট দিয়ে রেখেছে,

টিভি কোনো শব্দ করছে না। কিন্তু ওর দৃষ্টি অনুসরণ করছে স্ক্রিনের সব নড়াচড়াকে। দৃষ্টির মতোই নড়ছে হাত। চামচের পর চামচ ইয়োগার্ট তুলে মুখে পুরছে।

শিরাকাওয়ার মাথাও চলছে। চিন্তা আর কাজের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটা নিয়ে ভাবছে। কাজ কি শুধু চিন্তার বাস্তব রূপ? নাকি কাজের ফলাফল হচ্ছে চিন্তা? ওর চোখ নিবিড় দৃষ্টিতে দেখছে টিভিপর্দার মাছগুলোকে, কিন্তু মন পড়ে আছে দূরে, অনেক দূরে।

দেয়ালের ঘড়ির দিকে একবার তাকালো ও। চারটা বেজে তেত্রিশ মিনিট। দ্বিতীয় কাঁটাটা মসৃণ ভঙ্গিতে ডায়াল ঘিরে ঘুরছে। ঘুরছে পুরো পৃথিবী। বাধাহীন, বিরামহীন। একসাথে চলছে কাজ আর চিন্তা। অন্তত এখন পর্যন্ত।

অধ্যায় ১৫

স্ক্রিনে এখনো *গভীর জলের মাছ* চলছে, তবে টিভিটা শিরাকাওয়ার নয়। এই স্ক্রিনটা অনেক বড়। হোটেল অ্যালফাভিলের এক গেস্ট রুমে বসানো টিভি'র স্ক্রিন। মারি আর কোরোগি বসে আছে টেলিভিশনের সামনে। মনোযোগ পুরোপুরি অনুষ্ঠানের দিকে নেই। আলাদা চেয়ারে বসে আছে ওরা। মারি চোখে চশমা পরেছে। কোরোগি অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে ভ্রু কুঁচকাচ্ছে।

একটু পরেই ও রিমোট তুলে চ্যানেল বদলাতে শুরু করলো। কোনোটাতেই মজার কিছু দেখাচ্ছে না। টিভি অফ করে দিলো কোরোগি।

"তুমি টায়ার্ড না?" ও বলল। "যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও। কাওরু পেছনের রুমে ঘুমাচ্ছে।"

"নাহ্, বেশি ঘুম ধরেনি।" মারি জবাব দিলো।

"তাহলে এক কাপ চা হয়ে যাক, কী বলো?"

"যদি ঝামেলা না হয় তোমার।"

"কোনো ঝামেলা হবে না। চায়ের অভাব নেই আমাদের এখানে।"

একটা ফ্লাস্কে করে কোরোগি দু'জনের জন্য গরম গরম গ্রিন টি নিয়ে এলো।

"তুমি কয়টা পর্যন্ত কাজ করো?" মারি জানতে চাইলো।

"আমি আর কোমোগি এক টিমে, বুঝলে। আমরা রাত দশটা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত থাকি এখানে। রাতের গেস্টরা যাবার পর ঘর গোছাই। কাজকর্ম না থাকলে পড়ে পড়ে ঘুমাই।"

"অনেকদিন করছো এই কাজ?"

"দেড় বছর হয়ে গেছে বোধহয়। এ টাইপের কাজে কেউ বেশিদিন থাকে না।"

মারি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো, তারপর বলল: "তোমাকে...একটা প্রশ্ন করি? একটু পার্সোনাল। কিছু মনে কোরো না।"

"করে ফেলো।" কোরোগি জবাব দিলো। "তবে যা জানতে চাও সব হয়তো বলতে পারবো না।"

"তোমার খারাপ লাগবে না তো?"

"নাহ্, চিন্তা কোরো না।"

"তুমি বলছিলে তোমার আসল নাম বদলে ফেলেছো।"

"হ্যা, বলছিলাম তো ঠিকই।"

"কেন?"

কোরোগি মারি'র চায়ের কাপ থেকে টি-ব্যাগ তুলে নিলো, ফেললো একটা অ্যাশট্রে-তে। তারপর কাপটা মারি'র সামনে রাখলো।

"কারণ নাম না বদলালে আমার কপালে খারাবি ছিলো। অনেকগুলো কারণে। সত্যি বলতে আমি...কয়েকজন মানুষের থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।"

নিজের কাপে একবার চুমুক দিলো কোরোগি। "তুমি হয়তো এটা জানো না, কিন্তু কোনোকিছু থেকে আসলেই পালাতে চাইলে লাভ হোটেলে কাজ করার চেয়ে ভালো বুদ্ধি কমই আছে। সাধারণ হোটেলে কাজ নিলে হয়তো টাকা বেশি পাবে–টিপ্স বেশি পাবে–কিন্তু সেসব জায়গায় মানুষের সাথে দেখা করতে হয়, কথা বলতে হয়। কিন্তু লাভ হোটেলে কাজ করলে গেস্টদের চেহারা দেখার দরকার পড়ে না। ঘুমানোর জায়গাও পাওয়া যায়। আর তুমি আগে কী করতে, কোথায় থাকতে–এসব হাবিজাবি কেউ জানতে চায় না। ধরো তুমি বললে 'আমার আসল নাম জানানো যাবে না,' সেটা শুনে ওরা কী বলবে জানো?"

মারি দু'দিকে মাথা নাড়লো।

"'তাহলে কী বলে ডাকবো জানিয়ে দাও আর কাজ শুরু করো।'" কোরোগি হাসলো। "এসব জায়গায় চাকরি করার মতো লোক পাওয়া যায় না। এই দুনিয়াতে যারা কাজ করে তাদের অনেকেরই ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো না।"

"এজন্যই কি বেশিদিন থাকে না এক জায়গায়?"

"এজন্যই। এক জায়গায় অনেকদিন থাকলে কেউ না কেউ খোঁজ পেয়ে যাবে ঠিকই। তাই নতুন নতুন জায়গা খুঁজতে হয়, কখনো থামা যায় না। লাভ হোটেলের অভাব নেই জাপানে। হোকাইদো থেকে ওকিনাওয়া, কোথাও না কোথাও চাকরি হয়ে যাবে। এই হোটেলটা আমার পছন্দের

অবশ্য। কাওরু অনেক ভালো মেয়ে। এজন্য থেকে গেছি কয়েকদিন।"

"অনেকদিন ধরে পালাচ্ছো তুমি?"

"হুঁ। তিন বছরের মতো হয়ে গেছে।"

"এমন চাকরিই নিয়েছো প্রতিবার?"

"হ্যা।"

"যাদের কাছ থেকে পালাচ্ছো তারা অনেক ভয়ংকর, তাই না?"

"ভয়াবহ। কিন্তু এর বেশি কিছু জানতে চেও না, আমি বলতে পারবো না।"

দুইজন চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। মারি চায়ে চুমুক দিলো, কোরোগি তাকিয়ে রইলো বন্ধ টিভি'র পর্দার দিকে।

"আগে তুমি কী করতে?" মারি জিজ্ঞেস করলে। "মানে পালানো শুরু করার আগে।"

"আগে অফিসে চাকরি করতাম। হাই স্কুল শেষ করার পরে একটা বড় কোম্পানিতে জয়েন করেছিলাম। নয়টা থেকে পাঁচটা। এমনকি ইউনিফর্ম পর্যন্ত পড়তাম। তোমার মতোই বয়স ছিলো আমার। কোবে-তে ভূমিকম্প হলো না? ওই সময়। তারপর...একটা ঘটনা ঘটেছিলো। প্রথমে পাত্তা দেইনি। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি যে আমি আটকে গেছি। সামনে যেতে পারছি না, পেছনেও না। সবকিছু ছেড়ে দিলাম: আমার চাকরি, আমার ফ্যামিলি..."

মারি কোরোগি'র দিকে তাকালো, কিন্তু কিছু বলল না।

"সরি, তোমার নামটা যেন কী?" কোরোগি জিজ্ঞেস করলো।

"মারি।"

"তোমাকে একটা কথা বলি, মারি। আমাদের পায়ের নিচে যে মাটি আছে, সেটাকে হয়তো আজ শক্ত মনে হচ্ছে। সলিড মনে হচ্ছে। কিন্তু এই মাটির সরে যেতে বেশি সময় লাগে না। আর যখন সেটা হয়, তারপরে আর আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব না। অন্ধকারে একা থাকার অভ্যাস করে নেয়া বাদে আর কিছুই করার থাকে না।"

কোরোগি চুপ করে গেলো। মাত্র যেটা বলল সেটা নিয়ে ভাবছে। নিজের কথাই যেন পছন্দ হচ্ছে না, এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। "কে জানে," ও মুখ খুললো আবার। "হয়তো আমারই সমস্যা। ওই ঘটনাটা

থামাতে পারিনি কারণ আমি উইক ছিলাম। আমার জোর করা উচিত ছিলো, বলা উচিত ছিলো যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু পারিনি। তোমাকে লেকচার দেয়া উচিত হচ্ছে না আমার।"

"যদি ওরা তোমাকে খুঁজে পায় তাহলে কী হবে?"

"হুঁ...কী হতে পারে...জানি না আমি আসলে। সেটা নিয়ে বেশি চিন্তা না করাই ভালো।"

মারি কিছু বলল না। কোরোগি টিভি'র রিমোটটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো, কিন্তু টিভি ছাড়লো না।

"কাজ শেষ করার পর যখন রাতে ঘুমাতে যাই," ও বলল, "তখন ভাবি যে পরদিন আমার ঘুমটা না ভাঙাই ভালো। ঘুমিয়ে থাকতে চাই সারাজীবন। কারণ তাহলে কিছু নিয়ে টেনশন করতে হবে না। চিন্তা করতে হবে না। আমি স্বপ্ন দেখি অবশ্য। সবসময় একই স্বপ্ন। কেউ আমাকে তাড়া করছে। আমি ছুটছি, পালানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু একসময় হোঁচট খেয়ে যাই। তারপরে ওরা আমাকে ধরে ফ্রিজের মতো একটা জিনিসে আটকে রাখে, দরজায় তালা মেরে দেয়ে। ঠিক এ সময়টায় ঘুম ভেঙে যায় আমার, প্রতিবার। দেখি যে ঘামে ভিজে গেছি। শালারা আমি জেগে থাকলে তো পিছে লেগেই থাকে, এখন স্বপ্নেও পিছু করা শুরু করেছে।" কোরোগি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "কোনো শান্তি নেই। শুধু এখানে আসলে চিন্তা একটু কম হয়। কাওরু বা কোমুগি'র সাথে এক চা খেতে খেতে যখন আড্ডা দিই...জানো মারি, আমি আজকের আগে কাউকে এসব বলিনি। কাওরু আর কোমুগিকেও না।"

"তুমি যে পালাচ্ছো সেটা?"

"হ্যা। তবে ওরা এমনিতেই বুঝতে পারে বোধহয়।"

দুইজন আবার কিছুক্ষণের জন্য চুপ রইলো।

"তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছো?" কোরোগি জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, করবো না কেন?"

"আসলেই?"

"আসলেই।"

"আমি হয়তো পুরোটা বানিয়ে বলছি। আমাকে তো চেনো না তুমি।"

"তোমাকে দেখে মনে হয় না বেশি মিথ্যা বলো।" মারি বলল।

"সত্যি?" কোরোগি বলল। "যাক, শুনে খুশি হলাম। তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।"

ও শার্ট তুলে নিজের পিঠ দেখালো। মেরুদণ্ডের দু'পাশের চামড়ায় এক ধরনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তিন-তিন করে ছ'টা বাঁকা রেখা, অনেকটা পাখির পায়ের ছাপের মতো। মনে হলো গরম লোহার ছাপ দিয়ে চিহ্নগুলো তৈরি করা হয়েছে। শুকনো, কুঁচকানো চামড়া দাগগুলোর আশেপাশে। দেখেই মারি'র চেহারা বিকৃত হয়ে গেলো। কী ভয়াবহ যন্ত্রণা হওয়ার কথা ছাপগুলো দেয়ার সময়।

"এটা শুধু একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছো।" কোরোগি বলল। "আরো অনেক কিছু করেছে আমার সাথে। ওদের দাগ ফেলেছে আমার ওপর। আরো আছে, কিন্তু সেগুলো এমন জায়গায় যে তোমাকে দেখাতে পারবো না। এগুলো মিথ্যা না।"

"কী ভয়ংকর!"

"আগে কাউকে দেখাইনি। শুধু তোমাকে দেখালাম আজকে, মারি। ভেবো না আমি বানিয়ে বলছি।"

"না, বললাম তো, আমার মনে হয় না তুমি মিথ্যা বলো।"

"এমনি মনে হলো, বুঝলে। যে তোমাকে বলা যায়। বললে সমস্যা নেই। জানি না কেন মনে হয়েছে।" কোরোগি শার্ট নামিয়ে ফেললো আবার। তারপর যেন নিজের অনুভূতিতে দাড়ি দিলো একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

"কোরোগি?" মারি জিজ্ঞেস করলো।

"হুঁ?"

"তোমাকে আমি একটা কথা বলি? এটাও আগে কাউকে বলিনি।"

"বলে ফেলো।" কোরোগি জবাব দিলো।

"আমার একটা বোন আছে। একমাত্র বোন। আমার চেয়ে দুই বছরের বড়।"

"ঠিক আছে।"

"মাস দুয়েক আগে ও একদিন বলেছিলো: 'আমি ঘুমাতে গেলাম'। রাতে সবাই একসাথে খাচ্ছিলাম তখন। কেউ বেশি মাথা ঘামাইনি ওর কথা নিয়ে। সন্ধ্যা সাতটা বাজে মাত্র। কিন্তু আমার বোনের ঘুমের টাইমের

এমনিতেই কোনো ঠিক-ঠিকানা ছিলো না, তাই অবাক হইনি। খাবার ছোঁয়নি ও সে রাতে। সোজা রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে গেছে। তারপর আর ওঠেনি।"

"আর ওঠেনি মানে?"

মারি চুপ করে রইলো।

"দুই মাস ধরে ঘুমাচ্ছে?" কোরোগি জিজ্ঞেস করলো আবার। ওর ভ্রু কুঁচকে গেছে। "একবারও ঘুম ভাঙেনি?"

"মাঝে মাঝে ভাঙে বোধহয়।" মারি বলল। "ওর টেবিলে যা খাবার রাখি, ঘুরে এসে দেখি শেষ হয়ে গেছে। আর ও বাথরুমেও যায় বলে মনে হয়। কখনো কখনো গোসল করে জামাও বদলায়। বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে কম যেটুকু কাজ করা যায় সেটা করে ও বেঁচে আছে। তবে আমরা কেউ ওকে জাগতে দেখি না। যখনই উঁকি দিই, দেখি যে ঘুমিয়ে আছে। গভীর ঘুম, নকল না। হঠাৎ করে দেখলে মনে হতে পারে যে মরে গেছে। নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায় না। আমরা চিৎকার করে ডেকেছি ওকে, নাড়া দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই কাজ হয় না।"

"ডাক্তার দেখিয়েছো?"

"আমাদের ফ্যামিলি'র পরিচিত ডাক্তার আছে, সে এসে মাঝেমধ্যে দেখে যায়। এই ডাক্তার কোনো স্পেশালিস্ট না, এরি'র ওপর বড় টেস্ট চালানোর মতো ট্রেইনিং তার নেই। তবে যতোদূর মনে হয় ওর শরীরে কোনো সমস্যা নেই। টেম্পারেচার নরমাল। ব্লাড প্রেশার একটু লো, কিন্তু চিন্তা করার মতো কিছু না। খাওয়াদাওয়া করছে, স্যালাইন দেয়ারও দরকার নেই। শুধু ঘুমিয়ে আছে। যদি কোমা টাইপের কিছু হতো তাহলে আরো অনেক টেনশনে পড়তাম আমরা, কিন্তু তা তো না। উঠছে, খাচ্ছে। আলাদা চিকিৎসার দরকার পড়ছে না। একজন সাইকাইয়াট্রিস্টের সাথেও কথা বলেছি। কিন্তু এমন কিছু সে আগে দেখেনি। ঘুমাতে যাচ্ছি বলে এরি ঘুমিয়ে গেছে। যদি এতো বেশি ঘুমের দরকার হয়ে থাকে, তাহলে ওকে ঘুমাতে দেয়াই ভালো। আর চিকিৎসা শুরু করার আগে তো ওকে জাগাতে হবে, কিছু প্রশ্ন করতে হবে।"

"হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত না?"

"আমার বাবা-মা আশাবাদী মানুষ। ওদের ধারণা আমার বোন যেমন

হঠাৎ করে ঘুমিয়ে গেছে, তেমন হঠাৎ করেই আবার উঠে যাবে। এই স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে আছে ওরা। কিন্তু আমার ব্যাপারটা সহ্য হয় না। মেজাজ খারাপ হয়ে যায় মাঝেমধ্যে। একই ছাদের নিচে থাকি আমরা–কিন্তু ওর কী হচ্ছে সে ব্যাপারে কিছুই জানি না।

"এজন্য তুমি রাতের বেলা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরো?"

"আমার ঘুম আসে না," মারি বলল। "চেষ্টা করলে শুধু আমার বোনের কথা মনে পড়ে। বেশি খারাপ লাগলে বেরিয়ে যাই বাসা থেকে।"

"দুই মাস, না? লম্বা টাইম।"

মারি একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালো।

কোরোগি বলল: "আমি জানি না ওর ঠিক কী হয়েছে, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার বোন কোনো সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। নিজে থেকে সমাধান পাচ্ছে না। তাই ঘুমিয়ে আছে। সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করতে চায় না। এই দুনিয়া থেকে দূরে থাকতে চায়। আমি ভালো করেই চিনি এই ব্যাপারটা।"

"তোমার কোনো ভাই-বোন আছে, কোরোগি?"

"দুই ভাই। দু'জনই ছোট।"

"তোমার সাথে ওদের সম্পর্ক ভালো?"

"আগে তো ভালোই ছিলো। এখন...কে জানে। অনেকদিন দেখা হয় না ওদের সাথে।"

"সত্যি বলতে," মারি বলল, "আমি আমার বোনের সাথে ক্লোজ ছিলাম না কখনোই। সারাদিন কী করতো, কী ভাবতো–এসব ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। যদি আসলেই কোনো ঝামেলা হয়ে থাকে, সেটাও জানি না। কথাটা শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে, কিন্তু একই বাসায় থাকলেও আমাদের তেমন একটা দেখা হতো না। ও নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো, আমি আমারটা। মন খুলে কখনোই কথা হয়নি। রাগারাগি করে যে আলাদা হয়েছি এমন না। আমরা শেষ কবে তর্ক করেছি সেটা মনেও নেই আমার। কিন্তু আমাদের জীবন এতো আলাদা হয়ে গিয়েছিলো যে সেটাতে অন্যজনকে দেয়ার মতো জায়গা ছিলো না।" মারি অন্ধকার টিভি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কোরোগি বলল: "তোমার বোন মানুষ কেমন? যদি ও ভেতরে কেমন সেটা না জানো, বাইরে থেকে কেমন সেটা বললেই হবে।"

"ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। মিশনারিদের একটা ইউনিভার্সিটি আছে, সেখানে। এসব জায়গা চেনো নিশ্চয়ই, হাই-ফাই বড়লোক মেয়েরা ভর্তি হয় শুধু। ওর বয়স একুশ। সোশিওলজিতে পড়ছে, যদিও সেটাতে ওর তেমন আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। ইউনিভার্সিটিতে যে ভর্তি হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে যে অন্য সবাই তাই করে। পড়ালেখায় মোটামুটি, তাই অ্যাডমিশন পেতে সমস্যা হয়নি। এই। মাঝেমধ্যে ওর রিপোর্ট বা হোমওয়ার্ক করে দিলে আমাকে টাকাপয়সা দিতো। আর ও টিভি আর ম্যাগাজিনে মডেল হয়েছে কয়েকবার।"

"টিভি? কোন অনুষ্ঠানে?"

"তেমন কিছু না। ধরো কুইজ শো-এর শেষে পুরস্কারগুলো দেখানোর জন্য একজন মেয়ে আসে না? সেরকম একটা কাজ পেয়েছিলো। প্রোগ্রামটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে অবশ্য। এছাড়াও বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন করেছে কয়েকটা।"

"অনেক সুন্দরি, না?"

"সবাই তাই বলে। আমার সাথে ওর চেহারার কোনো মিল নেই।"

"মাঝে মাঝে মনে হয় আমি এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে জন্মালে কতো ভালো হতো। একবার যদি দেখতে পারতাম কেমন লাগে ব্যাপারটা।" কোরোগি ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললো।

মারি ইতস্তত করলো, যেন বড় কিছু বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে। "আচ্ছা, এটা শুনতে একটু আজব লাগতে পারে, কিন্তু আমার বোনকে শুয়ে থাকলে অসম্ভব সুন্দর দেখায়। জেগে থাকলে যেমন লাগে তার চেয়েও বেশি। মনে হয় ওর চামড়া স্বচ্ছ হয়ে গেছে। আমি ওর বোন হতে পারি, কিন্তু ওই অবস্থায় ওকে দেখলে আমারও হার্টবিট বেড়ে যায়।"

"ঘুমন্ত সুন্দরি।"

"একদম।"

"একদিন কেউ ওকে চুমু দিয়ে জাগিয়ে দেবে," কোরোগি বলল।

"তাই যেন হয়।"

দুইজন নীরব রইলো কিছুক্ষণ। কোরোগি এখনো রিমোটের বোতাম নিয়ে খেলা করছে। দূর থেকে ভেসে আসছে কোনো অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দ।

"আমাকে একটা জিনিস বলো তো মারি," কোরোগি নীরবতা ভাঙলো। "তুমি কি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করো?"

"না," মারি মাথা নাড়লো, "মনে হয় না।"

"মরার পরে আর কিছু নেই, তোমার মনে হয়?"

"বেশি চিন্তা করিনি এটা নিয়ে, কিন্তু মরার পরে কিছু থাকতে পারে এটা কেন জানি বিশ্বাস হয় না।"

"আচ্ছা। আমার মনে হয় পুনর্জন্ম থাকতে পারে। এটা বিশ্বাস না করার সাহস আমার নেই। 'কোনো কিছু নেই'—মানে শুধু শূন্যতা। শূন্যতা ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি না, ভয় লাগে।"

"কিছু নেই মানে কিছুই নেই। হয়তো আমাদের সেটা বোঝা সম্ভব না, দরকারও নেই।"

"ঠিক আছে, কিন্তু শূন্যতা যদি তেমন না হয়? যদি এমন কিছু হয় যেটা তোমার বুঝতেই হবে, যেটা নিয়ে চিন্তা করতেই হবে? মানে, আমি যেমন জানি না, তুমিও জানো না যে মরতে কেমন লাগে। মরার সময়টা কেমন। হয়তো সে সময় শূন্যতা বোঝা লাগে।"

"আচ্ছা, হতে পারে।" মারি বলল।

"এসব ভাবলে খুব ভয় লাগে আমার।" কোরোগি মাথা নাড়লো। "দম আটকে আসে। মনে হয় শরীরটা ছোট হয়ে আসছে। তার চেয়ে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করাই ভালো। হয়তো পরের জন্মে অনেক বাজে কিছু হয়ে ফেরত আসতে হবে, কিন্তু সেই জীবনটা অন্তত কল্পনা করা যায়। ঘোড়া হয়ে আসতে পারি, বা শামুক, বা শুকর। ওদের জীবনটা কেমন সেটা আমরা আন্দাজ করতে পারি। আর কে জানে, পরের জন্মে ভালো কিছু হয়ে আসারও সম্ভাবনা আছে।"

"ঠিক আছে...তাও আমার মনে হয় যে মরার পর আর কিছু নেই। সেটাকেই ন্যাচারাল লাগে।"

"তোমার তো অনেক সাহস, এজন্যই মনে হয় আরকি।" কোরোগি বলল।

"আমার?!" আকাশ থেকে পড়লো মারি।

কোরোগি মাথা ঝাঁকালো। "হ্যা, আর তুমি নিজেকে ভালোই বুঝতে পারো।"

মারি দুইদিকে মাথা নাড়লো। "নাহ্। ছোটবেলা থেকেই আমার নিজের ওপর তেমন ভরসা নেই, সবকিছুতে ভয় পেতাম। আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিতো স্কুলের অন্য ছেলেমেয়েরা। সে সময়ের কথা এখনো মনে আছে আমার, মাথায় আছে। স্বপ্ন দেখি সেসব নিয়ে।"

"হ্যা, কিন্তু এতোদিনে তুমি একটু একটু করে অনেক বদলে গেছো। খারাপ সময়গুলো পেছনে ফেলে এসেছো।"

"একটু একটু করে।" মারি সম্মত হলো। "অনেক সময় লেগেছে।"

"যেভাবে ভালো কামাররা সময় নিয়ে তরবারি বানায়, তাই না?"

"ঠিক।"

"সবাই পারে না সেটা।"

"কী?"

"নিজেকে সময় দেয়া, সমস্যা শুধরানোর জন্য কষ্ট করা।"

"এছাড়া আর তেমন কিছু নেই তো আমার জীবনে।"

কোরোগি কিছু না বলে হাসলো।

ও যা বলেছে সেটা নিয়ে মারি একটু ভাবলো। "হয়তো আমি আমার নিজের একটা পৃথিবী আসলেই বানাতে পেরেছি...কিন্তু সময় লেগেছে। অনেক সময়। আর এই পৃথিবীর ভেতরে থাকলে একটু স্বস্তি লাগে। কিন্তু এই যে আমার আলাদা একটা জগৎ বানাতে হয়েছে, এটা থেকেই বোঝা যায় যে আমি একটু দুর্বল। বাস্তব থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করি। ঠিক না? আর বাইরের দুনিয়ার সামনে আমারটা ছোট, অনেক বেশি ছোট। কার্ডবোর্ড দিয়ে বানানো বাড়ির মতো। জোরে বাতাস বইলে উড়ে যাবে।"

"তোমার কি বয়ফ্রেন্ড আছে?" কোরোগি জিজ্ঞেস করলো।

মারি মাথা নাড়লো। না।

"ভার্জিন নাকি তুমি?"

এবার মারি একটু লজ্জা পেলো। "হুঁ।"

"লজ্জার কিছু নেই। হতেই পারে।"

"হুঁ, জানি।"

"কাউকে পছন্দ হয়নি এখনো?"

"একটা ছেলে ছিলো কিছুদিন। কিন্তু..."

"এতোটা পছন্দ করোনি যে সবকিছু করে ফেলবে।"

"হ্যা, সেটাই।" মারি বলল। "আমার কৌতুহল ছিলো, কিন্তু ইচ্ছা ছিলো না। জানি না কেন..."

"আরে ব্যাপার না এসব।" কোরোগি বলল। "জোর করে হয় না। সত্যি বলতে আমি শুয়েছি অনেক ছেলের সাথেই, কিন্তু সেটা বোধহয় ভালোবাসার চেয়ে বেশি বোধহয় ভয়ের কারণে। কারও হাত আমাকে জড়িয়ে নেই, এটা ভাবতে ভয় লাগতো। না বলতে পারতাম না। সেটা থেকে ভালো কিছু হতো না কখনো। মনে হতো জীবনের অর্থগুলো একটু একটু করে খসে পড়ছে। বোঝাতে পারছি?"

"হ্যা, মনে হয়।"

"একদিন তোমার ঠিক ছেলের সাথে দেখা হবে, মারি। আর সেদিন তোমার নিজের ওপর ভরসা অনেক বেড়ে যাবে। আমার অন্তত তাই মনে হয়। সেই ছেলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। কোনো তাড়াহুড়া নেই। এই দুনিয়াতে কিছু কাজ একা করা যায়, আর কিছু কাজ করতে হয় অন্য কারো সাথে। এই দুইধরনের কাজের একটা ব্যালেন্স দরকার, দু'টোর কোনোটাই বেশি হওয়া ভালো না।"

মারি মাথা ঝাঁকালো।

কোরোগি কড়ে আঙুল দিয়ে কানের লতি চুলকালো। "আমার আর এসবের সুযোগ নেই।"

"আশা করি তুমি যাদের থেকে পালাচ্ছো তারা তোমাকে কোনোদিন ধরতে পারবে না," মারি গম্ভীর স্বরে বলল।

"মাঝে মাঝে মনে হয় নিজের ছায়ার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।" কোরোগি বলল। "কিন্তু এই একটা জিনিসের থেকে পালানো সম্ভব না। নিজের ছায়াকে কে ঝেড়ে ফেলতে পারে?"

"হয়তো ব্যাপারটা এরকম না।" মারি বলল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তারপর যোগ করলো: "হয়তো তোমার ছায়া না, ব্যাপারটা অন্যকিছু। একদম আলাদা কিছু।"

কোরোগি এই কথাটা নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর মাথা ঝাঁকালো ছোট্ট করে। "হতে পারে। আমি চেষ্টা করে যাবো। শেষ পর্যন্ত। এই একটা জিনিসই পারি।"

ও নিজের ঘড়ির দিকে তাকালো, তারপর সময় নিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো। সেটা শেষ হবার পর উঠে দাঁড়িয়ে বলল: "কাজের সময় হয়ে গেছে। তুমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো। ভোর হলে বাসায় চলে যাবে, ঠিক আছে?"

"আচ্ছা।"

"তোমার বোনের সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে আমার। কেন জানি না, তবে মনে হচ্ছে।"

"থ্যাংক ইউ।" মারি বলল।

"হয়তো ওর সাথে তোমার সম্পর্ক এখন খুব ভালো না, কিন্তু একসময় নিশ্চয়ই ছিলো। ওই সময়টার কথা মনে রেখো। যখন তোমাদের মধ্যে কোনো গ্যাপ ছিলো না। এখনই মনে পড়বে না, কিন্তু চেষ্টা করলে পারবে। যতো যাই হোক, ও তোমার বোন। অনেকগুলো বছর একসাথে কাটিয়েছো তোমরা। কোনো কোনো ভালো স্মৃতি আছে মাথার ভেতরে লুকানো।"

"আচ্ছা, আমি চেষ্টা করে দেখবো।" মারি বলল।

"আমি পুরনো দিনের কথা প্রায়ই চিন্তা করি। পালানো শুরু করার পর ব্যাপারটা আরো বেড়েছে। কতো কী হাবিজাবি যে মনে থাকে–মনে হয় মাত্র সেদিন ঘটেছে ঘটনাগুলো। বিষয়টা ইন্টারেস্টিং লাগে আমার কাছে। অথচ কতো জরুরি জিনিস ভুলে যাই।" কোরোগি রিমোট কন্ট্রোল হাতে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

"জানো আমার কী মনে হয়?" ও বলল। "মানুষের স্মৃতি হচ্ছে অনেকটা ফুয়েলের মতো। গাড়ির যেমন তেল পোড়াতে হয় চলার জন্য, আমরা বেঁচে থাকার জন্য সেভাবে স্মৃতি পোড়াই। এই স্মৃতিগুলো আসলে জরুরি কিনা তাতে তেমন কিছু আসে যায় না। কিন্তু এগুলো ছাড়া জীবন চলে না। ধরো পেপারে ছাপানো বিজ্ঞাপন, দামি বইয়ে ছাপানো দর্শন, দশ হাজার ইয়েন এর নোট–আগুনে দিলে এগুলো সবই শুধু কাগজ। আগুন তো চিন্তা করে না যে 'ওরে বাবা, এটা কান্টের থিওরি। একটু কম পোড়াই। স্মৃতির ব্যাপারটাও তাই। ধরো কিছু স্মৃতি আছে যেগুলো তোমার খুব পছন্দের, যেগুলো তুমি কোনোদিন হারাতে চাও না–হয়তো মায়ের চুমু, বা কোনো বিরাট বার্থডে পার্টি, বা প্রথমবারের মতো কোনো ছেলের হাত ধরা। আবার অনেক ফালতু স্মৃতিও আছে–আজ সকালে কী খেয়েছো, পাঁচ বছর আগে স্কুলের এক ম্যাডাম কী বলেছিলো, এসব। প্রত্যেকটা স্মৃতিই দরকার জীবনের জন্য, সেটা যেমনই হোক।" কোরোগি মাথা ঝাঁকালো, তারপর বলে যেতে লাগলো: "জানো, এই ফুয়েলটা যদি আমার ভেতর না থাকতো, যদি স্মৃতিগুলো না থাকতো, তাহলে বোধহয় পাগল

হয়ে যেতাম। হয়তো আত্মহত্যা করে ফেলতাম। যখন ইচ্ছা তখন স্মৃতিগুলোকে ড্রয়ার খুলে বের করে আনতে পারি দেখে এখনও বেঁচে আছি। শুধু পছন্দের স্মৃতিগুলো না, ফালতু স্মৃতিও। মাঝে মাঝে মনে হয় যে আর সম্ভব না, শেষ করে দিই সবকিছু, কিন্তু স্মৃতিগুলো আমাকে সেটা করতে দেয় না।"

মারি এখনও চেয়ারে বসে আছে। ও মুখ তুলে তাকালো কোরোগি'র দিকে।

"তুমিও হাল ছেড়ো না, ঠিক আছে?" কোরোগি বলল। "চেষ্টা করো। বোনের ব্যাপারে ভালো ভালো জিনিসগুলো মনে করার চেষ্টা করো। তোমার জন্য সেগুলো ফুয়েল হিসেবে কাজ করবে। হয়তো তোমার বোনের জন্যেও।"

মারি কিছু বলল না। দৃষ্টিও সরালো না কোরোগি'র ওপর থেকে।

আরেকবার ঘড়ি দেখলো কোরোগি। "যাই এখন।"

"থ্যাংক ইউ। সবকিছুর জন্য।"

কোরোগি হাত নেড়ে বেরিয়ে গেলো।

একা হবার পর মারি আবার চোখ বুলালো পুরো রুমের ওপর। লাভ হোটেলের ছোট্ট রুম। কোনো জানালা নেই। জানালার শাটারের মতো আছে এক জায়গায়, সেটার পেছনে একটা গর্ত। বিছানাটা রুমের তুলনায় বিশাল। মাথার কাছে অনেকগুলো সুইচ। প্লেনের ককপিটেও এতো সুইচ থাকে কিনা সন্দেহ। তার পাশে একটা ভেন্ডিং মেশিন। সাধারণ ভেন্ডিং মেশিনে পয়সা ফেললে ভেতর থেকে চকোলেট বা কফি বেরিয়ে আসে। এটা থেকে বের হয় ডিলডো আর ব্রা-প্যান্টি। এমন আজব জিনিস মারি আগে কখনো দেখেনি। এই ছোট্ট রুমে বসে থাকতে থাকতে ওর খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। মনে হলো ও খুব নিরাপদ একটা জায়গায় আছে। কেউ ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অনেকদিন পর একটা শান্তি নেমে এলো ওর মনে।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলো মারি। চোখ বন্ধ করে তলিয়ে গেলো ঘুমে। ওর ঘুম সংক্ষিপ্ত হলেও গভীর। বহুদিন অপেক্ষা করছিলো এমন ঘুমের জন্য।

অধ্যায় ১৬

তাকাহাশির ব্যান্ড যেখানে প্র্যাকটিস করে সে জায়গাটা একটা স্টোররুম। মাটির নিচে, বেসমেন্ট স্টোররুম। কোনো জানালা নেই এখানে। ছাদটা উঁচু, এখানে সেখানে উঁকি দিচ্ছে নগ্ন প্লাস্টিকের পাইপ। সিগারেট খাওয়া নিষেধ, কারণ ধোঁয়া বের হওয়ার জায়গা নেই।

রাত শেষের পথে। তাকাহাশি আর ওর ব্যান্ডের সদস্যরা অনেকক্ষণ সিরিয়াস প্র্যাকটিস করেছে। এখন জ্যাম করছে ওরা–যার যেমন ইচ্ছে বাজাচ্ছে, অন্যরা তাল দেয়ার চেষ্টা করছে সেটার সাথে। সব মিলিয়ে দশ জন আছে। দুইজন মেয়ে। তাদের একজন পিয়ানো বাজায়, আজ রাতে কিবোর্ড বাজাচ্ছে। আরেকজন হচ্ছে সপ্র্যানো-স্যাক্সোফোন বাদক।

কিবোর্ড থেকে ভেসে আসছে পিয়ানোর মতো সুর। তার পেছনে বাজছে অ্যাকুস্টিক গিটারের গম্ভীর বেইস। ড্রামসের জোরালো ছন্দ তাদের তাল দিচ্ছে। আর এই সবকিছু বাজছে তাকাহাশি'র ট্রমবোনের সুরকে ঘিরে।

ট্রমবোন জিনিসটা দেখতে অনেকটা স্যাক্সোফোন আর ট্রাম্পেটের মাঝামাঝি। ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। এ মুহূর্তে তাকাহাশি সনি রলিন্স নামে এক মিউজিশিয়ানের তৈরি করা সুর বাজাচ্ছে। 'সনিমুন ফর টু'। মাঝারি গতির সুর। খারাপ বাজাচ্ছে না তাকাহাশি। টেকনিকের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, একটা সহজ ছন্দ আছে বাজানোর ভঙ্গিতে। যেন গল্প করছে। হয়তো ওর ব্যক্তিত্বেরই প্রতিফলন সেটা।

চোখ বন্ধ করে নিজেকে সুরে ডুবিয়ে দিলো ও। আরও দুইজন স্যাক্সোফোন বাদক আছে এই ব্যান্ডে। টেনর স্যাক্স আর অল্টো স্যাক্স বাজায় তারা। তাকাহাশির মিউজিকের মাঝে মাঝে ঢুকছে তাদের সুর, ট্রাম্পেট বাদকও বাদ যাচ্ছে না।

যারা কিছু বাজাচ্ছে না তারা ফ্ল্যাস্ক থেকে কফি ঢেলে খাচ্ছে। সামনে প্রিন্ট করা কাগজ খোলা, সেখানে ছাপানো আছে মিউজিকের নোটেশন। কয়েকজন তাকাহাশিদের বাজানো শুনতে শুনতে নিজেদের বাদ্যযন্ত্র টিউন

করছে। কয়েকজন মাঝেমধ্যে উৎসাহ দিচ্ছে তাকাহাশিকে।

এই বদ্ধ জায়গায় মিউজিক অনেক জোরে শোনা যাচ্ছে। ড্রামার স্টিক দিয়ে বাজাচ্ছে, ব্রাশ ব্যবহার করছে। শব্দটা যেন আরেকটু নরম লাগে। ঘরের একদিকে কয়েকটা চেয়ার জড়ো করে তাদের ওপর লম্বা একটা তক্তা ফেলা হয়েছে। টেবিল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। এই তক্তার ওপর রাখা বেশ কয়েকটা পিৎজা বক্স, কফির ফ্ল্যাস্ক, কাগজের কাপ, মিউজিকের নোটেশন, একটা ছোট টেপ রেকর্ডার আর স্যাক্সোফোনের কিছু অংশ। এই অংশগুলোকে বলে 'রিড'।

ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। সবাই কোট আর জ্যাকেট পরে বাজাচ্ছে। কয়েকজন দস্তানা আর মাফলারও পরে নিয়েছে। দৃশ্যটা একটু অদ্ভুত।

তাকাহাশি থামলো। গানে ওর যে অংশটা, সেটা শেষ হয়ে গেছে। এখন বাজাবে শুধু বেইস আর স্যাক্সোফোন বাদকেরা।

সবারটা শেষ হবার পর ওরা দশ মিনিটের বিরতি নিলো। সবাই একটু ক্লান্ত। সারারাত প্র্যাকটিস করেছে। এমনিতে অনেক গল্প হয় ওদের মধ্যে, তবে আজ বেশি হচ্ছে না। পরের গানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সবাই। একজন আড়মোড়া ভাঙলো, আরেকজন কফিতে চুমুক দিলো। অন্য একজন বিস্কিট চিবাচ্ছে। সিগারেট খেতে বাইরে গেছে দুইজন। শুধু যে মেয়েটা পিয়ানো বাজায়, সে এখনো বসে আছে নিজের কিবোর্ডের সামনে। লম্বা চুল তার, পিঠ পর্যন্ত নেমে এসেছে। কিবোর্ডে বিভিন্নভাবে আঙুল চেপে এক-একটা কর্ড প্র্যাকটিস করছে।

তাকাহাশি একটা চেয়ারে বসে নিজের মিউজিক নোটেশনগুলো গুছিয়ে নিলো। তারপর ট্রমবোনটা নিলো হাতে। অনেকক্ষণ ট্রমবোন বাজালে সেটার ভেতর থুথু জমা হয়, ফুঁ দেয়ার সময় যন্ত্রে ঢুকে যায় মুখের লালা। সেটা জমা হয় যন্ত্রের এক অংশে। সে অংশটা খুলে পরিষ্কার করলো তাকাহাশি। তারপর ট্রমবোন ভরে রাখলো কেসের ভেতর। আর বাজাতে চায় না।

যে ছেলেটা বেইস বাজাচ্ছিলো সে এসে দাঁড়ালো তাকাহাশি'র পাশে। বেশ লম্বা ছেলেটা। তাকাহাশির কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল: "দারুণ বাজিয়েছো, তাকাহাশি। একদম ফিল দিয়ে।"

"থ্যাংক ইউ।" তাকাহাশি জবাব দিলো।

ট্রাম্পেট বাদক লম্বা-চুলো এক ছেলে। সে জিজ্ঞেস করলো: "আজ

আর বাজাবে না?"

"নাহ্। কাজ আছে একটা। সরি, আজকে একটু চলে যাচ্ছি।"

*

শিরাকাওয়ার বাসার রান্নাঘর। টিভিতে বিপ করে একটা শব্দ হলো–পাঁচটা বেজে গেছে সেটার সংকেত। এনইচকে চ্যানেলে খবর শুরু হয়েছে। সংবাদপাঠক সরাসরি তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। দায়িত্বশীল ভঙ্গিতে খবর পড়ছে। শিরাকাওয়া ডাইনিং টেবিলে বসে আছে। ভলিউম কমিয়ে টেলিভিশন দেখছে। অনেক কম ভলিউম, প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। শিরাকাওয়া টাই ঢিলে করে নিয়েছে, হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো। সামনে ইয়োগার্টের খালি কৌটো।

খবর দেখার তেমন ইচ্ছে নেই ওর। কোনোকিছু করতেই ইচ্ছে করছে না। ঘুমও আসছে না।

টেবিলে বসে ও একবার নিজের ডান হাতের মুঠি খুলছে, আবার বন্ধ করছে। হাতের ব্যথাটা স্বাভাবিক নয়। এই ব্যথার সাথে জড়িয়ে আছে স্মৃতি।

শিরাকাওয়া উঠে ফ্রিজ থেকে সবুজ রঙের পেরিয়েরের পানির বোতল বের করলো। সেটা হাতে ঠেকিয়ে চেষ্টা করলো যন্ত্রণা কমাতে। তারপর ক্যাপ খুলে এক গ্লাস পানি ঢাললো। ঢকঢক করে খেলো পানিটা।

চশমা খুলে নিজের চোখ ডলতে শুরু করলো ও। ঘুম নেই, এখনো ঘুম নেই। শরীর ক্লান্ত, সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু মাথার ভেতর কিছু একটা ঘুরছে যেটা ঘুমাতে দিচ্ছে না। তাড়ানো যাচ্ছে না সেই 'কিছু'-টাকে। হাল ছেড়ে দিয়ে শিরাকাওয়া আবার চশমা পরলো। দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো টিভির দিকে। খবরে ইস্পাত এক্সপোর্ট নিয়ে একটা সিরিয়াস দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। তারপর এলো ইয়েন-এর মূল্য। এক মা তার দুই বাচ্চাকে মেরে নিজে আত্মহত্যা করেছে। নিজের গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। গাড়ির ঝলসানো কালো শরীরের একটা শট। ধোঁয়া বের হচ্ছে এখনো। কিছুদিন পরেই শুরু হবে ক্রিসমাসের কেনাকাটা।

রাত প্রায় শেষের পথে। কিন্তু শিরাকাওয়ার জন্য এতো সহজে শেষ

হবে না। ওর পরিবার জেগে উঠবে একটু পরেই। তার আগেই ঘুমানো দরকার।

*

অ্যালফাভিল হোটেলের ভেতর একটা রুম। মারি একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়েছে, গভীর ঘুমে। সাদা মোজা ওর পায়ে। পাদু'টো একটা নিচু কাঁচের টেবিলে রাখা। ওর চেহারায় একটা স্বস্তির ছাপ আছে। মোটা বইটা উলটো করে শোয়ানো টেবিলের ওপর, মাঝামাঝি এক জায়গায় খোলা। এই রুমের উজ্জ্বলতাতে মারি'র কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। টিভি বন্ধ, নিস্তব্ধ। বিছানা গোছানো আছে। ঘরের ছাদে যে হিটার লাগানো সেটার মৃদু গুঞ্জন বাদে আর কোনো শব্দ নেই।

দোকানে ও বাদে আর কোনো কাস্টমার নেই। জাপানিজ মিউজিশিয়ান শিকাও শুগা'র 'বম্ব জুস' গানটা বাজছে দোকানের স্পিকারে। তাকাহাশি টুনা মাছের একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিলো। সেটাকে জড়িয়ে নিলো প্লাস্টিকে। তারপর নিলো এক প্যাকেট দুধ। সেটার এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে গেছে কিনা দেখলো। ওর জীবনে দুধ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারে ও কোনো হেলাফেলা করে না।

ঠিক সে মুহূর্তে খাবারের তাকে রাখা একটা মোবাইল ফোন বাজতে শুরু করলো। শিরাকাওয়া ফোনটা এখানেই রেখে গিয়েছিলো। তাকাহাশি সন্দিহান চোখে তাকালো ফোনটার দিকে। এখানে কে মোবাইল রেখে গেলো আবার? ক্যাশ কাউন্টারের দিকে তাকালো তাকাহাশি, কিন্তু দোকানদারের দেখা নেই।

ফোনটা বাজছে এখনো। কী করা যায়? ও ফোন তুলে নিলো। রিসিভ বাটন চেপে ঠেকালো কানে।

"হ্যালো?"

"তুই পালাতে পারবি না।" সাথে সাথে জবাব দিলো একটা পুরুষকণ্ঠ। "যতোদূরেই ভাগতে চাস, আমরা খুঁজে বের করবো তোকে।"

কণ্ঠটা নির্বিকার, ভাবলেশহীন। যেন মুখস্থ বলছে। তাকাহাশি কিছুই বুঝলো না। "দাঁড়ান, দাঁড়ান।" ও বলতে শুরু করলো। গলা চড়ে গেছে। কিন্তু লোকটা ওর কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। সে আগের

মতোই ভাবলেশহীন স্বরে বলল: "একদিন দেখবি কাঁধে টোকা পড়েছে। পেছনে ফিরবি। দেখবি আমরা দাঁড়িয়ে আছি। সেদিন দেখবো তোর চেহারাটা কেমন।"

"আরে ভাই-"

"মনে রাখিস।" লোকটা বলল।

জবাবে কী বলা উচিত তাকাহাশির মাথায় এলো না। চুপ করে রইলো। ফোনটা ঠাণ্ডা লাগছে হাতে।

"তুই ভুলে যেতে পারিস কী করেছিস, কিন্তু আমরা ভুলবো না।"

"ভাই, আমি জানি না আপনি কিসের কথা বলছেন। ভুল মানুষকে বলছেন এসব-"

"কোনোদিন পালাতে পারবি না।"

লাইনটা কেটে গেলো। মরে গেলো যেন ফোনটা। শেষ মেসেজটা পড়ে রইলো একা, নিঝুম দ্বীপে বন্দী অসহায় কোনো নাবিকের মতো। তাকাহাশি হাতে ধরা ফোনের দিকে তাকিয়ে রইলো। এই লোক যে 'আমরা' বলল, তারা কারা সে ব্যাপারে তাকাহাশি'র বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। লোকটা কাকে খুঁজছিলো সেটাও জানে না। কিন্তু কণ্ঠটা বাজছে এখনো কানে। যে কানের লতিটা নষ্ট, সেখানে। তিক্ত কোনো অভিশাপের মতো। মসৃণ, শীতল একটা অনুভূতি হচ্ছে হাতে, যেন ও মুঠোতে ধরে আছে একটা সাপ।

কাউকে তাড়া করছে একদল লোক, তাকাহাশি ভাবলো। কেন কে জানে। লোকটা যেমন ঘোষণা দেয়ার সুরে কথা বলল, সেটা শুনে মনে হয় ধরবে ঠিকই। কোথাও, কোনো একদিন ঠিকই ধরবে। কাঁধে টোকা দেবে। তারপর?

যাই হোক, আমার কী? ও মনে মনে বলল। শহরের গোপন কুঠুরিগুলোতে এভাবে হাজার হাজার মানুষে রক্ত ঝরে। অন্য জগতের বাসিন্দারা ভেসে আসে এই পৃথিবীতে। আমার সাথে এসবের সম্পর্ক নেই, তাকাহাশি ভাবলো। একটা ফোন বাজছিলো, কার না কার ফোন ভেবে ধরেছি। হয়তো হারানো ফোনটা ফিরিয়ে দিতে পারবো এই আশায়।

মোবাইলটা বন্ধ করে আবার তাকের ওপর রেখে দিলো ও। ক্যামেমবার্ট পনিরের প্যাকেটের পাশে। এটা নিয়ে আর মাথা না ঘামানোই ভালো। বের হই তাড়াতাড়ি। এই কুঠুরি থেকে যতো দূরে যাওয়া যায় ততো ভালো।

কাউন্টারে এসে কয়েকটা নোট ফেললো তাকাহাশি, স্যান্ডউইচ আর দুধের দাম।

ভোর পাঁচটা বেজে পঁচিশ মিনিট

তাকাহাশি একা বসে আছে পার্কের বেঞ্চে। সেই পার্কটায়, বেড়ালরা ঘোরাঘুরি করে যেখানে। পাশাপাশি দুলছে দু'টো দোলনা, মাটি ঢেকে গেছে পচা পাতায়। আকাশে ভাসছে চাঁদ। পকেট থেকে নিজের মোবাইল বের করে তাকাহাশি একটা নম্বর চাপলো।

অ্যালফাভিলের সেই রুম, যেখানে মারি ঘুমাচ্ছিলো। ফোনের রিং শোনা যাচ্ছে। চার বার পাঁচ নম্বর রিং হবার পর মারি জেগে উঠলো, ভ্রু কুঁচকে তাকালো ঘড়ির দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে ও রিসিভারটা তুলে নিলো।

"হ্যালো," ও বলল অনিশ্চিত সুরে।

"হ্যালো, আমি বলছিলাম। ঘুমাচ্ছিলে নাকি?"

"হ্যা এইতো একটু।" মারি জবাব দিলো। রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে গলা খাঁকাড়ি দিলো, যেন তাকাহাশি শুনতে না পায়। তারপর বলল: "শুয়ে ছিলাম আরকি। একটা চেয়ারে।"

"নাস্তা করতে যাবে? ওই রেস্টুরেন্টে? অমলেটের কথা বলছিলাম যে? সেটা পছন্দ না হলে আরও খাবার আছে ওখানে, আমি শিওর।"

"তোমার প্র্যাকটিস শেষ?" মারি জিজ্ঞেস করলো। নিজের গলাই ওর কাছে অপরিচিত লাগছে। *আমি হচ্ছি আমি, আবার আমি না*।

"হ্যা, শেষ। ভয়ংকর ক্ষুধা লেগেছে। তোমার কী অবস্থা?"

"না, তেমন না, সত্যি কথা বলতে। বাসায় যাওয়া উচিত আমার।"

"কোনো সমস্যা নেই। তোমাকে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেবো আমি। ট্রেন আসা শুরু হয়েছে বোধহয়।

"এখান থেকে স্টেশনে একা যেতে আমার কোনো সমস্যা হবে না।" মারি বলল।

"তোমার সাথে আরেকটু কথা বলতে চাই, যদি তোমার আপত্তি না থাকে। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি? যদি তুমি কিছু মনে না করো আরকি।"

"না, মনে করবো কেন।"

"ঠিক আছে। আমি আসছি দশ মিনিটের মধ্যে।"

"আসো।" মারি বলল।

তাকাহাশি লাইন কেটে ফোনটা আবার পকেটে পুরলো। বেঞ্চ থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙলো, তারপর তাকালো আকাশের দিকে। এখনো অন্ধকার। সেই এক ফালি বাঁকা চাঁদ এখনো ভাসছে। আজব লাগলো ওর ব্যাপারটা। এই শহরের আকাশে এতো বড় চাঁদ কাউকে ভাড়া না দিয়ে ঝুলছে কিভাবে?

"কোনোদিন পালাতে পারবি না," তাকাহাশি মুখে বলল, চাঁদের দিকে তাকিয়ে। শব্দগুলোর প্রতিধ্বনি হলো ওর মনের ভেতর, কোনো রূপকের মতো। কোনোদিন পালাতে পারবি না। তুই ভুলে যেতে পারিস কী করেছিস, কিন্তু আমরা কোনোদিন ভুলবো না। কথাগুলোর অর্থ নিয়ে চিন্তা করলো তাকাহাশি। হয়তো অন্য কারো উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছিলো না। ওর জন্যেই ছিলো এসব কথা, শুধু ওর জন্য। হয়তো ব্যাপারটা আচমকা ঘটেনি। মোবাইল ফোনটা কি ওর জন্যই অপেক্ষা করছিলো? "আমরা," তাকাহাশি ভাবলো। এই আমরা কে হতে পারে? আর ওরা কী ভুলবে না কোনোদিন?

তাকাহাশি কাঁধে ট্রমবোনের কেসটা ঝুলিয়ে নিলো। আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলো অ্যালফাভিলের দিকে। গাল ঘষলো একবার। খোঁচা খোঁচা দাড়ি উঠেছে। শেষ রাতের আঁধার পাতলা চামড়ার মতো ঢেকে রেখেছে শহরকে। ময়লার ট্রাক দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। শহরের বিভিন্ন জায়গায় যারা রাত কাটিয়েছে তারা আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছে নিজেদের গন্তব্যে। কেউ হাঁটছে পাতাল রেলের স্টেশনের দিকে, প্রথম ট্রেনটাই ধরবে তারা। মাছের ঝাঁক যেভাবে দল বেঁধে স্রোতের সাথে ভেসে যায়, সেভাবে ছুটবে শহরের প্রান্তের দিকে। যারা রাতের বেলা কাজ করে, যে তরুণ-তরুণীরা সারারাত পার্টি করেছে-দুই দলের মানুষই আছে এই ঝাঁকে। সবাই এখন চুপচাপ, বেশি শব্দ করছে না। এমনকি যে তরুণ জুটি ভেন্ডিং মেশিন থেকে বিয়ার কিনে খাচ্ছে তারাও কিছু বলছে না একে অপরকে। শুধু উপভোগ করছে সান্নিধ্যের উষ্ণতা।

প্রায় এসে গেছে নতুন দিন, কিন্তু পুরনোটার ভারি রেশ সম্পূর্ণ কাটেনি এখনো। ঠিক যেভাবে মোহনায় সমুদ্রের পানি আর নদীর পানি ঝাঁপিয়ে পড়ে একে অপরের ওপর। তাকাহাশি এখনো বুঝতে পারছে না যে কোনদিকে খুঁজে পাবে নিজের জীবনের ভারসাম্য।

তাকাহাশি ট্রমবোনের কেসটা এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নিলো। তারপর বলল: “এমন না যে আমাদের জীবন সবসময় সুন্দর করে সিরিয়াস আর হাসিখুশি সাইড হিসেবে গোছানো থাকে। সত্যিটা হচ্ছে ছায়ার মতো, আলো আর অন্ধকারের মাঝামাঝি। বুদ্ধিমান, সুস্থ মানুষ এই ছায়াকে চিনতে পারে। আর বুদ্ধিমান আর সুস্থ হতে সময় লাগে। চেষ্টাও লাগে। আমার মনে হয় না তুমি বেশি সিরিয়াস বা গম্ভীর।”

এবার মারি ভেবে দেখলো। “তবে আমি একটা ভীতু,” ও বলল।

“না, এটা একদমই ভুল। ভীতু মেয়েরা সারারাত এভাবে একা একা বাইরে কাটায় না। তুমি এখানে কিছু একটা খুঁজতে এসেছিলে, তাই না?”

“এখানে বলতে কী বোঝাচ্ছো?”

“আলাদা কোনো জায়গা–তোমার পরিচিত এলাকার বাইরে।”

“কে জানে এখানে কিছু পেয়েছি কিনা।”

তাকাহাশি হেসে মারি’র দিকে তাকালো। “যাই হোক, আমি তোমার সাথে আবার দেখা করতে চাই, কথা বলতে চাই। অন্তত একবার।”

মারি তাকালো তাকাহাশির দিকে। ওদের দৃষ্টি বিনিময় হলো।

“সেটা সম্ভব না বোধহয়।”

“সম্ভব না?”

“হুঁ।”

“মানে তোমার আর আমার কোনোদিন দেখা হবে না?”

“হ্যা, প্র্যাকটিকালি তো তাই মনে হচ্ছে।”

“তোমার কি বয়ফ্রেন্ড আছে?”

“না, আপাতত কেউ নেই।”

“আমাকে তোমার পছন্দ হচ্ছে না?”

মারি মাথা নাড়লো। “না, সেটা বলছি না। সামনের সোমবার থেকে আমি জাপানে থাকবো না। ফরেন স্টুডেন্ট হিসেবে বেইজিং যাচ্ছি। কমপক্ষে সামনের জুন পর্যন্ত থাকতে হবে।”

তাকাহাশির চেহারা দেখে মনে হলো বেশ অবাক হয়েছে। “হ্যা, স্বাভাবিক। তুমি তো অনেক ভালো ছাত্রি।”

“যখন অ্যাপ্লাই করেছিলাম তখন মনে করিনি যে নেবে–এমনি দিয়েছিলাম আরকি। পরে দেখি আসলেই নিয়ে নিয়েছে।”

“চমৎকার। কনগ্র্যাট্‌স!”

“তো যাই হোক, এখানে আমি বেশিদিন নেই। আর এই কয়েকটা দিন হয়তো রেডি হতে হতেই যাবে...”

“হ্যা, ঠিক আছে।”

“কী ঠিক আছে?”

“তুমি বেইজিং-এ যাওয়ার জন্য রেডি হবে, অনেককিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, আমার সাথে দেখা করার সময় পাবে না। ঠিক আছে।” তাকাহাশি বলল। “সমস্যা নেই। আমি ওয়েট করতে পারি।”

“কিন্তু আমি তো সামনের ছয় মাস জাপানে ফিরবো না।” মারি বলল।

“আমাকে দেখে হয়তো বোঝা যায় না, কিন্তু আমার ধৈর্য আছে ভালোই। আর সময় নষ্ট করা আমার স্পেশালটি। ওখানে তোমার যে ঠিকানা সেটা দিও আমাকে, ঠিক আছে? মাঝেমধ্যে চিঠি পাঠাবো।”

“আচ্ছা, সমস্যা নেই।”

“তুমি কি চিঠি পাঠাবে আমাকে?”

“হুঁ,” মারি ছোট্ট করে বলল।

“আর তুমি যখন জাপানে ফিরবে–সেটা যখনই হোক, তখন আমরা সেই ডেইট বা যা বলো সেটাতে যাবো, ঠিক আছে? আমরা চিড়িয়াখানাতে যেতে পারি, বোটানিকাল গার্ডেনে যেতে পারি, বা অ্যাকুয়ারিয়ামে–যেখানে ইচ্ছা। তারপর আমরা খুব স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে রান্না করে অমলেট খাবো।”

মারি আবার সরাসরি তাকাহাশি'র চোখের দিকে তাকালো–যেন কিছু একটা মেপে নেয়ার চেষ্টা করছে।

“আমাকে তুমি পছন্দ করো? কেন?”

“গুড কোয়েশ্চন। আমি নিজেও এখন একদম ঠিক করে বলতে পারবো না। কিন্তু যদি...যদি আমরা আরো দেখা-টেখা করি, কথাবার্তা বলি, তাহলে হয়তো একসময় আমাদেরকে ঘিরে ফ্র্যান্সিস লাই-এর মিউজিক বাজা শুরু করবে। তখন সব গুছিয়ে বলতে পারবো। কপাল ভালো থাকলে হয়তো বরফও পড়বে।”

স্টেশনে আসার পর মারি ওর পকেট থেকে একটা ছোট লাল নোটবুক বের করলো। বেইজিং-এ যেখানে থাকবে, সেই ঠিকানা লিখে ধরিয়ে দিলো তাকাহাশি'র হাতে। কাগজটা তাকাহাশি ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলো।

“থ্যাংক ইউ।” ও বলল। “আমি তোমাকে লম্বা চিঠি লিখবো, ঠিক আছে?”

স্টেশনের অটোমেটিক গেটের সামনে এসে মারি একটু দাঁড়ালো। কী যেন ভাবলো। যেন বুঝতে পারছে না তাকাহাশিকে একটা কথা বলা ঠিক হবে কিনা।

"আমার এরি আসাইয়ের ব্যাপারে একটা কথা মনে পড়েছে।" ও বলল। সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কথাটা বলে দেবে। "অনেকদিন পর্যন্ত মনে ছিলো না। কিন্তু তুমি যে আমাকে হোটেলে ফোন করলে–ওই যে যখন আমি চেয়ারে ঘুমাচ্ছিলাম, তখন মাথায় এসেছে। তোমাকে এখন বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না।"

"অবশ্যই বলা উচিত।"

"জিনিসটা মাথায় ফ্রেশ থাকতে থাকতে আমি বলতে চাই। নাহলে হয়তো কয়েকটা ব্যাপার ভুলে যাবো।"

তাকাহাশি কানে হাত দিয়ে দেখালো যে ও শুনতে প্রস্তুত।

"আমি যখন কিন্ডারগার্টেনে ছিলাম," মারি শুরু করলো, "এরি আর আমি একবার আটকে গিয়েছিলাম আমাদের বিল্ডিং-এর লিফ্ট-এ। হয়তো ভূমিকম্প হয়েছিলো বা কিছু। লিফ্টা প্রচণ্ড ঝটকা খেয়ে তারপর ধাম করে থেমে গিয়েছিলো। লাইট বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো প্রায় সাথে সাথে। সবকিছু অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো। মানে সবকিছু, নিজের হাত পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমরা দু'জন বাদে আর কেউ ছিলো না লিফটে। আমি অনেক ভয় পেয়েছিলাম। শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিলো। মনে হচ্ছিলো হাত-পা পাথরের বানানো। নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না, মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছিলো না। এরি ডাকছিলো আমাকে, কিন্তু জবাব দিতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিলো মগজ অবশ হয়ে গেছে। যেন দেয়ালের ফাটল দিয়ে দূর থেকে এরি'র গলা ভেসে আসছিলো।"

মারি চোখ বন্ধ করে এক মুহূর্ত সেই আঁধারের কথা চিন্তা করলো।

তারপর বলতে লাগলো আবার: "আমার মনে নেই কতোক্ষণ অন্ধকার ছিলো। এখন ভাবলে মনে হয় অনেকক্ষণ। আসলে হয়তো এতো সময় ছিলো না। তবে পাঁচ মিনিট-বিশ মিনিট যতোক্ষণই থাকুক, সেটা এখন আর ইম্পর্ট্যান্ট না। ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার হচ্ছে: ওই পুরো সময়টা এরি আমাকে জড়িয়ে ধরে ছিলো। এতো শক্ত করে ধরেছিলো যে মনে হচ্ছিলো দুইজনের শরীর গলে এক হয়ে যাবে। এক সেকেন্ডের জন্য ঢিল দেয়নি। মনে হচ্ছিলো এক চুল আলাদা হলেই আমরা আর একজন আরেকজনকে

দেখতে পাবো না কোনোদিন।”

তাকাহাশি গেটে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। এখনো নীরব। মারি'র গল্প শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করছে। মারি জ্যাকেট থেকে ডান হাত বের করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর মুখ তুলে বলতে লাগলো আবারঃ

“এরি নিজেও অনেক ভয় পেয়েছিলো। আমার চেয়েও বেশি হয়তো। নিশ্চয়ই ওর চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছিলো। মাত্র ক্লাস টু-তে পড়তো তখন। কিন্তু তাও শান্ত থেকেছে। সমস্যা শুরু হওয়ার সাথে সাথে ঠিক করেছিলো যে ভেঙে পড়বে না। আমার জন্য বড় বোন হবার দায়িত্ব নিতে হবে। আমার কানে ফিসফিস করে বলছিলোঃ সব ঠিক হয়ে যাবে। ভয়ের কিচ্ছু নেই। আমি আছি তোমার সাথে। একটু পরেই কেউ আসবে আমাদের নিয়ে যেতে। ওর গলা একদম ঠাণ্ডা ছিলো। এমনকি গান গেয়েও শুনিয়েছে আমাকে। চাচ্ছিলাম ওর সাথে গান গাইতে, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছিলো না। কিন্তু এরি থামেনি। একা একাই গেয়ে যাচ্ছিলো। আমি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম ওর হাতে, আমাদের দু'জনের মধ্যে কোনো সীমানা ছিলো না। মনে হচ্ছিলো হার্টবিটও একসাথে চলছে। তারপর ধুপ করে লাইট জ্বলে উঠলো, আর একবার কেঁপে ওঠা শুরু করলো লিফ্‌টটা।”

মারি একমুহূর্ত অপেক্ষা করলো। স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে ও, ঠিক শব্দগুলো খুঁজছে।

“কিন্তু ওই শেষ বার। ওই সময়...কিভাবে বলা যায় কথাটা...জীবনে এই একটা বার এরি'র কাছে আসছে পেরেছিলাম আমি। একবারই আমাদের মধ্যে কোনো বাধা ছিলো না, দূরত্ব ছিলো না। কিন্তু তারপর থেকে আমরা শুধু দূরেই সরেছি, দূরেই সরেছি। চলে গেছি আলাদা দুনিয়ায়। লিফটের অন্ধকারে যেভাবে কাছে এসেছিলাম আমরা, আমাদের মধ্যে যে একটা বন্ধন তৈরি হয়েছিলো, সেটা আর কোনোদিন ফিরে আসেনি। আমি জানি না ভুল কোথায় হয়েছে, কিন্তু সে জায়গায় আর ফিরে যেতে পারিনি আমরা।”

তাকাহাশি হাত বাড়িয়ে মারি'র হাত ধরলো। এক মুহূর্তের জন্য চমকে গেলো মারি, কিন্তু হাত সরালো না। তাকাহাশি আস্তে করে ধরে রইলো। অনেকক্ষণ। মারি'র হাত নরম, উষ্ণ।

“আমি যেতে চাই না।” মারি বলল।

“চায়নাতে?”

“হুঁ।”

“কেন?”

“আমার ভয় লাগছে।”

“সেটা খুবই স্বাভাবিক।” তাকাহাশি বলল। “নতুন, অচেনা একটা জায়গায় যাচ্ছো। একা একা।”

“হ্যা।”

“কিন্তু তোমার সমস্যা হবে না, আমি জানি। আমি চিনি তোমাকে। তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করবো আমি।”

মারি মাথা ঝাঁকালো।

“তুমি অনেক সুন্দর।” তাকাহাশি বলল। “জানো সেটা?”

মারি চোখ তুলে ওর দিকে তাকালো। তারপর হাত সরিয়ে পুরলো নিজের জ্যাকেটের পকেটে। চোখ পায়ের দিকে চলে গেলো। দেখছে যে হলুদ জুতোতে ময়লা লেগেছে কিনা।

“থ্যাংক ইউ। কিন্তু আমার এখন বাসায় যেতে হবে।”

“আমি চিঠি লিখবো তোমাকে। অনেক লম্বা চিঠি। পুরনো উপন্যাসে যেমন দেখা যেতো।”

“ঠিক আছে,” মারি বলল।

ও ঢুকে গেলো অটোমেটিক গেট দিয়ে। প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত এলো, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলো একটা ট্রেনের ভেতর।

তাকাহাশি বাইরে থেকে তাকিয়ে ছিলো ওর দিকে। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন ছাড়ার সিগনাল এলো। একটানে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেলো ট্রেনটা।

ট্রেন যখন মিলিয়ে গেলো দৃষ্টিসীমার বাইরে, তাহাকাশি মাটি থেকে ওর ট্রমবোনের কেসটা নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো। তারপর ও আগাতে লাগলো নিজের প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্যে। আস্তে আস্তে এই স্টেশনে মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

অধ্যায় ১৮

এরি আসাইয়ের রুম।

জানালার বাইরে দিনের আলো ফুটছে। এরি ঘুমিয়ে আছে নিজের বিছানায়। গতবার ওর চেহারা, অভিব্যক্তি যেমন দেখেছিলাম এখনো তেমনই আছে। ঘুমের ভারি চাদরে নিজেকে ঢেকে রেখেছে।

মারি এসে রুমে ঢুকলো। আস্তে করে দরজা খুললো ও, যেন বাসার অন্য কেউ টের না পায়। তারপর চাপিয়ে দিলো ধীরে। ঘরটা অতিরিক্ত নীরব, আর শীতল। মারি একটু নার্ভাস। দরজার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। চোখ বুলালো পুরো ঘরে। সবকিছু দেখলো খেয়াল করে। হ্যা, এই রুমটা চেনে ও। সবকিছু আগের মতোই আছে। অপরিচিত কিছু লুকিয়ে নেই ঘরের ছায়ায়। তারপর ও বিছানার দিকে এগিয়ে গেলো। ওর বোন ঘুমিয়ে আছে, চেহারা ভাবলেশহীন। হাত বাড়িয়ে এরি'র কপাল স্পর্শ করলো মারি। আস্তে করে নাম ধরে ডাকলো। কোনো সাড়া নেই। আগের মতোই। ডেস্কের সামনে থেকে চেয়ারটা টেনে আনলো মারি, বসলো সেটায়। মনোযোগ দিয়ে এরি'র মুখ দেখলো, বোঝার চেষ্টা করলো যে কোনো অভিব্যক্তি আছে কিনা।

পাঁচ মিনিটের মতো কেটে গেলো। মারি উঠে দাঁড়ালো, মাথা থেকে ক্যাপটা খুলে নিলো। তারপর হাতঘড়ি খুলে ডেস্কের ওপর রাখলো। এক এক করে জ্যাকেট আর ফ্ল্যানেলের শার্টও খুলে ফেললো। শুধু একটা সাদা টি-শার্ট পরনে ওর। এর পর খুললো মোজা আর জিন্স। তারপর আস্তে করে বোনের বিছানায় উঠলো।

কম্বলের নিচে নিজের শরীরকে অভ্যস্ত হবার সময় দিলো ও। কিছুক্ষণ পর একটা শুকনো হাত রাখলো বোনের বুকে। চুপ করে শুনতে লাগলো। তারপর নিজের গাল ঠেকালো এরি'র গালের সাথে। কান পেতে শুনছে ও। বোনের প্রতিটা হার্টবিট শুনছে। হঠাৎ, কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই, ওর চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করলো। বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা। ব্যাপারটা খারাপ

লাগলো না ওর, মনে হলো এটাই স্বাভাবিক। মারি'র গাল বেয়ে এরি'র জামা ভিজিয়ে দিতে শুরু করলো অশ্রু।

ও বিছানায় উঠে বসলো। এক হাতে মুছে ফেললো চোখের পানি। মনে হলো এমন কিছু করে ফেলেছে যেটা আর কোনোদিন ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়, কোনোদিন বদলানো সম্ভব নয়। অনুভূতিটা এলো আচমকা, আগে যা হয়েছে তার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু অনেক শক্তিশালী এই অনুভূতি, অনেক প্রবল।

আবার ওর চোখ ভিজে গেলো। হাতের তালু দিয়ে অশ্রু ঠেকালো মারি। ফোঁটাগুলো রক্তের মতো উষ্ণ, নিজের শরীরের উষ্ণতার সাথে মিলেমিলে গেছে। হঠাৎ করে একটা কথা মনে হলো: আমি অন্য কোথাও থাকতে পারতাম। এরি অন্য কোথাও থাকতে পারতো।

নিজেকে শান্ত করার জন্য মারি আবার রুমের চারদিকে চোখ বুলালো। তারপর চোখ ফিরিয়ে আনলো বোনের দিকে। এরিকে ঘুমালে খুব সুন্দর লাগে। ফ্রেমে বাঁধাই করে রাখার মতো একটা চেহারা। শুধু চেতনা নেই এ মুহূর্তে চেহারায়। লুকিয়ে আছে হয়তো, কিন্তু আছে কোথাও গভীরে। মাটির গভীরে যেভাবে পানি লুকিয়ে থাকে। মৃদু অনুভূতির ঢেউ টের পাচ্ছে মারি। অতল গহীনে নয়, কাছেই কোথাও। এই ঢেউয়ের সাথে মিশে যাচ্ছে মারির নিজের অনুভূতি। ও বুঝতে পারছে সেটা। আমরা তো বোন, ও ভাবলো।

নিচু হয়ে বোনের ঠোঁটে চুমু খেলো মারি। তারপর আবার মাথা তুলে দেখলো। সময় কাটতে দিলো কিছুক্ষণ। নিজের হৃদস্পন্দন গুনলো: এক-দুই, এক-দুই। তারপর আবার চুমু খেলো এরি'র ঠোঁটে। মনে হলো নিজেকেই চুমু দিচ্ছে। মারি আর এরি। একটা অক্ষরের শুধু পার্থক্য। একবার হাসলো ও, যেন স্বস্তি পেয়েছে। বোনের পাশে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়লো। এরি'র যতো কাছে যাওয়া সম্ভব যেতে চায়, ওর শরীরকে উষ্ণতা দিতে চায়, ওর হৃদয়কে জাগিয়ে তুলতে চায়।

"ফিরে এসো, এরি।" মারি ফিসফিস করলো। "প্লিজ ফিরে এসো।" চোখ বন্ধ করে নিজেকে এলিয়ে দিলো ও। ঘুম চলে এলো আস্তে আস্তে। সমুদ্রের নরম ঢেউয়ের মতো ঢেকে ফেললো ওকে নিদ্রা। চোখে আর পানি নেই।

জানালার বাইরে আলো বাড়ছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকছে আলোর

সরু রশ্মি। আগের সময় সরে যাচ্ছে। অনেক মানুষ এখনো বিড়বিড় করে উচ্চারণ করছে পুরনো শব্দ, কিন্তু নতুন সূর্যের আলোতে শব্দগুলোতে ঝলসে উঠছে নতুন নতুন অর্থ। যদি এটাও ধরে নিই যে এই অর্থগুলো একদিনের বেশি টিকবে না, তারপরেও–একদিন অনেক লম্বা সময়।

ঘরের কোণায় টিভিটা জীবন্ত হলো এক মুহূর্তের জন্য। স্ক্রিন থেকে যেন আলো ছড়াচ্ছে। কিছু একটা নড়ছে সেখানে, হয়তো একটা ছবি তৈরি হচ্ছে। সার্কিট কি চেষ্টা করছে আবার কানেকশন বসাতে? নিশ্বাস বন্ধ করে আমরা তাকিয়ে আছি টিভি'র দিকে।

পরমুহূর্তেই নিভে গেলো টিভিটা। শুধু অন্ধকার। হয়তো আসলে কিছু দেখিনি আমরা। চোখের ভুল ছিলো। জানালার আলো পড়েছিো স্ক্রিনে। ঘরে এখনো বিরাজ করছে নীরবতা। কিন্তু সেটা হালকা হয়েছে আগের চেয়ে। কমে গেছে চাপ। বাইরে থেকে পাখির ডাক ভেসে আসছে। আমাদের কান আরেকটু শক্তিশালী হলে রাস্তায় সাইকেলের চাকা ঘোরার শব্দ শুনতে পেতাম, মানুষের কথা শুনতে পেতাম। নাস্তা রান্না করার শব্দও হয়তো কানে আসতো। সূর্য কোনো খরচ ছাড়াই সবখানে ছড়িয়ে দিচ্ছে নিজের উজ্জ্বলতা।

দুই বোন শুয়ে আছে পাশাপাশি, গভীর ঘুমে নিমজ্জিত। ছোট বিছানায়, একে-অপরকে জড়িয়ে। আমরা বাদে কেউ জানে না এই কথা।

ভোর ছয়টা বেজে তেতাল্লিশ মিনিট

সেভেন-ইলেভেন দোকানের ভেতর ক্যাশিয়ার হাতে লিস্ট নিয়ে ঘুরছে। কি কি আইটেম আছে তার হিসেব রাখছে। স্পিকারে বাজছে জাপানিজ র‍্যাপ গান। এই ছেলেটাই কাউন্টার থেকে তাকাহাশির টাকা তুলে নিয়েছে। রোগাপাতলা গড়ন ছেলেটার, ডাই করে চুলে লাল রঙ লাগানো।

নাইট শিফট করে ক্লান্ত হয়ে গেছে সে। কিছুক্ষণ পর পর হাই তুলছে। স্পিকারের গানের ফাঁকে ফাঁকে কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে ফোনের রিং। সোজা হয়ে চারিদিকে দেখলো ছেলেটা। তারপর তাকগুলোর ওপর চোখ বুলালো। দোকানে কোনো কাস্টমার নেই। মানুষ বলতে শুধু ও-ই আছে। কিন্তু এটা তো ওর ফোনের রিং নয়? কী অদ্ভুত, ছেলেটা ভাবলো।

সবগুলো তাক ঘুরে ঘুরে খোঁজার পর শেষপর্যন্ত ফোনটা চোখে পড়লো।

এমন জায়গায় ফোন রেখে যায় কোন বোকাচোদা? ও মনে মনে বলল। জিভ দিয়ে চুক করে একটা শব্দ করলো, তারপর এক হাতে তুলে নিলো মোবাইলটা। রিসিভ বাটন চেপে কানে ঠেকালো।

"হ্যালো?"

"তুই কি ভাবছিস বেঁচে গেছিস?" ওপাশ থেকে প্রশ্ন করলো একটা ভাবলেশহীন পুরুষ কণ্ঠ।

"হ্যালো?" দোকানী ছেলেটা আরো জোরে বলল।

"পালাতে পারবি না। কোনোদিন না।" সংক্ষিপ্ত, বিপজ্জনক নীরবতায় কাটলো তার পরের কয়েকটা সেকেন্ড।

কট করে লাইনটা কেটে গেলো।

ভোর ছয়টা বেজে পঞ্চাশ মিনিট

নিজেদেরকে আবার দৃষ্টিভঙ্গিতে বদলে নিয়েছি আমরা। ভাসছি শহরের ওপরে বাতাসে। মহানগরীকে জেগে উঠতে দেখছি আমরা। এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যাচ্ছে বিভিন্ন রঙের ট্রেন, বুকে করে নিয়ে যাচ্ছে শত শত মানুষ। ট্রেনের ভেতরের মানুষগুলোর প্রত্যেকের আলাদা চেহারা আছে, আলাদা মন আছে, কিন্তু আবার সবাই মিলে তৈরি করেছে একটা সমষ্টি। প্রত্যেকে সম্পূর্ণ একটা জিনিস, আবার প্রত্যেকে সম্পূর্ণ আরেকটা জিনিসের অংশ। এই দ্বৈত পরিচয়ের সাথে সবাই অভ্যস্ত, সচেতনভাবে না হলেও অবচেতনভাবে।

সবগুলো মানুষ সকালে উঠে নিখুঁত, দক্ষভাবে দাঁত ব্রাশ করে, শেভ করে, গলায় দেয় টাই, ঠোঁটে দেয় লিপস্টিক। টিভিতে সকালের খবর দেখতে দেখতে বৌ বা স্বামীর সাথে কথা বলে। নাস্তা করে। বাথরুমে যায়।

সকালবেলা ঝাঁক বেঁধে কাকেরা আসে। খুকরে খায় আবর্জনা। তেলতেলে ডানায় ঝিকমিক করে সকালের রোদ। মানুষের মতো বিভিন্ন পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়না পাখিদের। ওদের একমাত্র চিন্তা হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য খাবার জোগাড় করা। সেটা নিয়ে সমস্যা হবার কথা নয়। বিশাল এই শহরে আবর্জনার অভাব নেই। কা-কা ডাকতে ডাকতে জঙ্গী

বিমানের মতো ডাইভ দিচ্ছে কাকের দল।

নতুন সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে শহরের জানালাগুলোর কাঁচে। আগুনের মতো জ্বলছে লম্বা সব বিল্ডিং-এর স্বচ্ছ দেয়াল। আকাশে একফোঁটাও মেঘ নেই, দিগন্তে শুধু দেখা যাচ্ছে কালো ধোঁয়ার ঢেউ। ফ্যাকাশে একফালি চাঁদ ঝুলে আছে নিঃসঙ্গ ভাস্কর্যের মতো, অনেক আগে হারিয়ে যাওয়া চিঠির মতো। ঘাসফড়িঙের মতো বাতাসে কাঁপছে একটা হেলিকপ্টার, খবর পাঠাচ্ছে নিউজ স্টেশনের কাছে। রাস্তাগুলোতে ভিড় জমাতে শুরু করেছে অনেক গাড়ি। গলিগুলোতে এখনো জড়োসড়ো হয়ে আছে শীতল ছায়া। এই ছায়াগুলোতে লুকিয়ে আছে রাতের স্মৃতি।

ভোর ছয়টা বেজে পঞ্চান্ন মিনিট

শহরের আকাশ ছেড়ে নেমে এসেছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ঢুকেছে একটা মোটামুটি সম্ভ্রান্ত পাড়ায়। এখানকার বাড়িগুলোর সামনে ছোট ছোট উঠান আছে। সবগুলো বাড়ি একইরকম দেখতে, এখানে যারা থাকে তাদের ইনকাম কাছাকাছি পর্যায়ের। গাঢ় নীল রঙের ভলভো গাড়ির ছাদে ঠিকরাচ্ছে সকালের রঙ। একটা উঠানে গলফ প্র্যাকটিস করার জন্য নেট লাগানো হয়েছে। কয়েকজন নিজেদের পোষা কুকুরের সাথে মরনিং ওয়াকে বের হচ্ছে। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে নাস্তা তৈরি করার শব্দ। পরিবারের সদস্যরা ডাকছে একে-অপরকে। এ দিনটা অন্য সব দিনের মতোই হতে পারে, আবার হতে পারে মনে রাখার মতো অসাধারণ একটা দিন। সাদা কাগজের মতোই সম্ভাবনায় ভরা একটা সকাল।

একটা বাড়ি বেছে নিয়ে আমরা নেমে এলাম সেটার দিকে। কাঁচ আর পর্দা ভেদ করে ঢুকলাম দোতলার একটা ঘরে। এরি'র রুমে চলে এসেছি আবার। মারি গুটিশুটি হয়ে ঘুমাচ্ছে ওর পাশে। এরি'র চেহারায় শান্তির ছাপ। একটু যেন উষ্ণতা ছড়িয়েছে ওর ভেতরে। গালে লেগেছে রঙের ছোঁয়া। স্বপ্ন দেখছে? নাকি কোনো স্মৃতি থেকে জন্ম নিয়েছে ঠোঁটের কোণের ওই হাসি?

রাতের দীর্ঘ অন্ধকার কাটিয়ে এসেছে মারি, কথা বলেছে অন্ধকারের বাসিন্দাদের সাথে। এখন ফিরে এসেছে নিজের বাড়িতে, নিজের পরিবারের

কাছে। আপাতত ওর কোনো বিপদ নেই, কোনো ঝুঁকি নেই। উনিশ বছরের এই তরুণীকে ঘিরে রেখেছে ছাদ, দেয়াল, দেয়ালকে ঘিরে রেখেছে সবুজ রঙের বেড়া।

মারি'র বাঁ হাত বালিশে ছড়িয়ে থাকা বোনের চুলের ওপর রাখা। আঙুলগুলো আলতো করে খোলা, শান্তিপূর্ণ ঘুমের সময় যেমন হয়।

এরি'র শোয়ার ভঙ্গিতে বা অভিব্যক্তিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ওর বোন যে পাশে এসে শুয়েছে সেটা টের পেয়েছে বলে মনে হয় না।

শেষ পর্যন্ত এরি'র ছোট্ট মুখ একটু নড়ে উঠলো। যেন সাড়া দিচ্ছে কোনোকিছুতে। সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগের জন্য দেখা গিয়েছে সামান্য কম্পন। কিন্তু আমরা হচ্ছি দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের কাজ শুধু দেখা। তাই এই সুক্ষ পরিবর্তনও আমাদের নজর এড়ালো না। হয়তো এই কম্পন একটা সংকেত। যে সামনে কিছু আসছে। চেতনার জানালা দিয়ে কিছু একটা জানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা নিশ্চিত সেই ব্যাপারে।

ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে এই নতুন সম্ভাবনা স্পষ্ট হচ্ছে। আমরা দেখার চেষ্টা করছি ব্যাপারটা, বোঝার চেষ্টা করছি। অবশেষে খুলে গিয়েছে রাতের দুয়ার। আবার অন্ধকার আসতে দেরি হবে।